শ্রীরামকৃষ্ণ

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯
দূরভাষ : ৩৪-৯৫৯২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

কামারপুকুরে ফুটল রে, ফুটল রে
সৌরভযুত, পূত পদ্ম ফুল !
ভোর হলো—ভোর হলো !
চোখ মেলো—চোখ মেলো !
জয়, জয়, জয় বলো ! জয় রামকৃষ্ণ !

কে এই রামকৃষ্ণ ?—কে এই শ্রীরামকৃষ্ণ ?

আদি কবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন রামায়ণ। রামায়ণ একখানি মহাকাব্য এবং ধর্মপুস্তক। সেই পুস্তকে বলা হয়েছে, ত্রেতাযুগে ছিলেন একটি মানুষ। তাঁর নাম রাম। তিনি ছিলেন সুন্দর, তিনি ছিলেন বীরবর, তিনি ছিলেন গুণধর। যেন মণি মুক্তা রত্নে ভরা রত্নাকর—মহাসাগর।

মহাকবি ব্যাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন মহাভারত। মহাভারত একখানি মহাকাব্য এবং ধর্মপুস্তক। সেই মহাভারতে বলা হয়েছে,—দ্বাপর যুগে ছিলেন একটি মানুষ। তাঁর নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছিলেন বীর, ছিলেন বিদ্বান, ছিলেন বিশ্বের সকলেরই ভালো করবার মতো একটি মানুষ।

'গীতা' নামে একখানি বই আছে। বইখানি খুবই ভালো। সে যেন এক চমৎকার আলো! শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে বীরবর অর্জুনকে অনেক ভালোকথা বলেছেন। গীতা পুস্তকে সেই সকল কথা রয়েছে। সেই গীতা যেন মানুষের মিতা—বন্ধু।

সেই যে ত্রেতা যুগের রাম, আর দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ—রাম

ও কৃষ্ণ, তাঁরা যেন কলিকালে এসে করলেন কোলাকুলি। দুইয়ে মিলে এক হয়ে, হয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় প্রথম দেখা দিলেন?—দেখা দিলেন কামারপুকুর নামে গ্রামে। সেই তাঁর জন্মস্থান। সেই কামারপুকুর হুগলী জেলায় এখনও রয়েছে। বঙ্গভূমিতে রয়েছে। ধন্য হয়েছে। একটি তীর্থস্থান হয়ে গেছে। পুণ্য প্রার্থীদের যেন একটি নৃত্যস্থান হয়ে গেছে! নিত্য নিত্য নৃত্যস্থান!

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, যার জীবনকথা লোকে ভোলে না, শ্রদ্ধা ক'রে স্মরণ করে, তার জীবনই হয় সার্থক। কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি—যাঁর কীর্তি আছে, সুনাম আছে, সেই সত্যি বেঁচে আছে। যে করে ভালো ভালো কাজ, সে-ই তো মানুষের মধ্যে সত্যি সত্যি এক মহারাজ! তার নানারকম গুণই হয় তার পোষাক ও সাজ।

কত বছর আগে শিশু শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীময়ী এই পৃথিবীর মাটি প্রথম স্পর্শ করেছিলেন?

—তা এখন থেকে প্রায় সওয়া শ' বছর আগে হবে।

তাঁর জন্ম মাসটির নাম ফাল্গুন! মৌমাছিরা তখন করছে গুনগুন। ফুটেছে তখন কত ফুল। বন-উপবনকে করেছে আকুল।

কে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা? কে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা? কে তাঁর পিতা-মাতারূপ দেবতা?

রামকৃষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মাতার নাম চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি ছিলেন ধর্ম বিষয়ে ধনী। তাঁরা দেবতার পূজা করতেন। গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন।

একদিন ক্ষুদিরাম ঘুমিয়ে আছেন। তখন তিনি স্বপ্নে পেলেন এক নারায়ণ শিলা। সেই নারায়ণ শিলাকে তিনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেবা-অর্চনা করতে লাগলেন।

একদিন চন্দ্রমণি ঠাকুরাণী অনুভব করলেন, তাঁর অতি কাছেই আছেন যেন এক দেবতা।

এইভাবে, ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি লাভ করলেন দেবতার দয়া। লাভ করলেন স্বর্গের স্পর্শ।

তার পরেই একদিন তাঁরা পেলেন শিশু রামকৃষ্ণকে কোলে লাভ করার হর্ষ।—তাঁরা হলেন রামকৃষ্ণের বাবা ও মা।

হিন্দুদের ধর্মপুস্তকে বলে,—পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ। পিতার সেবা করাই একটা তপস্যার মতো। আরও বলে, মাতা এই পৃথিবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের চেয়েও বড়।

সুন্দর মনোহর শিশু গদাধর

সেই যে ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণির মণি সেই শিশুটি—তার নাম রাখা হল গদাধর।

সেই যে গদাধর, সুন্দর তার অধর। সেই অধর লাল। কত বড় চওড়া তার কপাল! সে যেন এক স্বর্গের শিশু, এসেছে এই পৃথিবীর মাটির উপর।

গদাধর হাসে, নাচে।

বয়েস তার পড়ে পাঁচে।

গদাধর হেসে হেসে নাচে। কথা কয় আধ-আধ ভাবে। ক্রমে সে দিল পা পাঁচে—তার বয়েস হল পাঁচ বছর। সুন্দর তার কলেবর বা শরীর। নয়ন তার মোহন। মানুষের মনকে

সহজেই করে আকর্ষণ। তার দৃষ্টি যেন একটা মিষ্টি! যেন স্বর্গের একটা সন্দেশ! তার মানে—স্বর্গের একটা সংবাদ।

কাকের কা-কা, কোকিলের কুহু-কুহু শিশু গদাধর শোনে। তখন হয়ত কৃষ্ণের কথা জাগে তার মনে।

শিশু গদাধর শোনে আর সকল শিশুর কলরব। সেই কলরব তার কাছে হয় যেন একটি আনন্দের উৎসব।

শিশু গদাধর দেখে আর সকল শিশুর হাসি আর কান্না। সে সব কি হয় তার কাছে চুনি আর পান্না?

শিশু গদাধরের হাস-নাচ তো আছেই। কিন্তু এইবার এই বয়েসে তার কিছু কাজও যে আছে!

কি সেই কাজ?

—লেখাপড়া শেখার কাজ।

লিখতে হবে, পড়তে হবে!

তবে তো তুমি মানুষ হবে!

বুড়োদের মুখের এই কথাই তো ঠিক।

এইবার তাই গদাধরের বিদ্যাশিক্ষার হাতে খড়ি।

শুভদিন দেখা হল। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ডাকা হল। পণ্ডিত মশায়কে সমাদরের সাথে ডাকা হল। গদাধরকে স্নান করানো হল। নতুন কাপড় পরানো হল। কপালে তার দেওয়া হল চন্দনের ফোঁটা। তখন সে যেন দেখতে হল একটি ফুল, সদ্যফোটা।

তখন সেই ফোটা ফুলের ফটো নেওয়া হয়েছিল কি? হয়তো তা তখন সম্ভব হয় নি।

গদাধরের হাতে কলম ধরানো হল। বড় বড় অ আ ক খ-এর উপর তার হাত ধরে কলম চালানো হল।

গদাধরের লেখা পড়া শেখা শুরু হল।

আমাদের বাংলার বড় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ভালো ভালো বই লিখেছেন। তিনি তাঁর ছেলেবেলায় এক-দিনেই নাকি অ আ ক খ সব শিখেছিলেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খুব ছেলে বয়েসেই নাকি কবিতা বানিয়েছিলেন।

মানুষের ছেলেবেলা হয়ে উঠতে পারে নানারকম গুণের মেলা।

গদাধরের তো হাতে খড়ি হল।

তার পর ?

তার পর পাঠশালায় যাওয়া। সেখানে লেখাপড়া শেখার মিষ্টি স্বাদ পাওয়া। আর পিঠের উপর যষ্টিস্বাদ পাওয়া! মাঝে মাঝে দুই একটি কানমলা খাওয়া। এই রকম কোন্ ছেলেমেয়ের না হয় ?

গদাধর পাঠশালায় যায়। সেখানে সে হয় তো পড়ে :

মন দিয়ে লেখ, পড়।

সকলের ভালো কর।

শিশু গদাধর পাঠশালার শিশুদের সঙ্গে মেশে। তাদের কাছে ঘেঁষে। কিন্তু সে সবই করে হেসে হেসে।

সে কাউকে ভ্যাংচায় না, খিমচায় না।

কাউকে ভেংচি কাটে না, খিমচি মারে না। সে সকলের গলায় হাত দিয়ে সকলের মন আনন্দে গলায়। মিষ্টি কথা বলে। তুষ্টি কথা বলে। সবার সাথে মিলে মিশে চলে।

যে হয় একটি শিশু, তার হওয়া উচিত সু অর্থাৎ ভালো।— এই ভাবটি যেন শিশু গদাধরের ভাবে, ভঙ্গীতে, কথাবার্তায় দেখা যায়।

শিশু গদাধর কারোর গায়ে ধুলো দেয় না, থুথু দেয় না। কারো গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারে না।

শিশু গদাধর কুকুর দেখলে, মুগুর ছোঁড়ে না। ছাগল-পাঁঠা দেখলে খোঁচায় না, লাথি মারে না, ঢিল ছোঁড়ে না। ব্যাং দেখলে, তার ঠ্যাং ভাঙতে যায় না। পাখি দেখলে, পিট্‌টি লাগাতে চায় না।

সে সকল শিশুকে করে আদর। তারা যেন তার সোদর! সে যেন তাদের সোদর!

মোরা সব বোন ভাই।
মিলে মিশে থাকা চাই।

—এই ভাবটি যেন শিশু গদাধরের ভাবে-ভঙ্গীতে কথাবার্তায় দেখা যায়।

বালক গদাধর কোন বিষয়ে ফাঁকি দেয় না, মিছে কথা কয় না। যা কিছু মিছে, তা যেন তার কাছে একটা বিছে—ক্ষতিকর।

মিছেটার মোচড়াব কান!
কাটব কান—কাটব কান!

—নধর ছেলে গদাধরের এই ভাব।

কিন্তু লেখাপড়ায় শিশু গদাধরের মন কতটা, কি রকম?

লেখাপড়া কি তার কাছে ছানাবড়া, রসবড়া? না, চৈতের রোদের মত কড়া ও চড়া?

ভাল কাজের আলো

গদাধর লেখে-পড়ে। কিন্তু তার মন আরও নানা দিকে ঘোরে ফেরে।

গাঁয়ে কথকতা হয়। কত লোক সেখানে জড়ো হয়। ঢোল বাজে, করতাল বাজে। 'হরি বোল! হরি বোল!' শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে।

একদিন কথক ঠাকুর রামায়ণের কথা বলেন।

ত্রেতা যুগে এক বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম রাম। তিনি তাঁর পিতার সত্য পালনের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন। তিনি লঙ্কার দুষ্ট রাজা রাক্ষস রাবণকে বধ করেছিলেন।

বলবান বানর হনুমান ছিল রামের খুব ভক্ত। সে লাফ দিয়ে সাগর পার হয়ে লঙ্কায় গিয়েছিল। সে তার লেজে-লাগানো আগুন দিয়ে লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করেছিল।

রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ বছরে ছয় মাস ঘুমোত। শূয়োর, শিয়াল, হাতী, বাঘ সে গিলে গিলে খেত।

রাবণের ছেলে মেঘনাদ ছিল মস্ত বড় বীর। সে মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করত।

রামায়ণে আছে আরো কত কত কথা। সেই সব কথা ব'লে কথক ঠাকুর করেন কথকতা।

অন্য দিন কথক ঠাকুর বলেন মহাভারতের কথা—

রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন সৎ। তাঁর জ্ঞাতি ভাই দুর্যোধন, দুঃশাসন ছিল অসৎ। দুর্যোধন পাশা খেলায় ছলনা করে যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দিল। তখন যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে নিয়ে বনে যেতে বাধ্য হলেন। কয়েক বছর ধরে কত কষ্ট পেলেন।

তারপরে কুরুক্ষেত্রে ঐ দুই পক্ষের যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধকে বলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের বা যুধিষ্ঠিরদের হল জয়। কৌরবদের বা দুর্যোধনদের হল পরাজয়।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। বালক গদাধর ঐ সব কথকতা শুনত।

সে শুনত উশীনর নামক ত্যাগী রাজার কথা। মহাত্যাগী মুনি দধীচির কথা। দাতা কর্ণের কথা। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা; আরুণি, উতঙ্ক, উপমন্যুর গুরুভক্তি; ব্যাধের ছেলে একলব্যের অস্ত্রচালনা-শিক্ষা; রাজা নহুষের প্রেত হয়ে যাওয়া; তপস্যার বলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হওয়া, অগস্ত্যমুনি কর্তৃক সমুদ্রের সব জল পান করে ফেলা—এই সবও সে শুনত।

গদাধর ঐ সবের অনুকরণে নানা খেলা খেলত। সে সাধু-সাধু খেলত। মুনি-মুনি খেলত। আর রামায়ণ, মহাভারতের ঐ সব কথা বলত।

বালক গদাধর গাইত ধর্ম-গান। সেই গান মাতিয়ে তুলত সবার প্রাণ।

তার সুর ছিল সুমধুর।

সেই সুর মানুষের মনকে ভাল ভাবে করত ভরপুর।

গাঁয়ে কোন কোন সময়ে দূর থেকে সাধুরা আসতেন। বালক গদাধর তখন সেই সাধুদের কাছে যেত। তাঁদের খুশী করবার জন্য নানা কাজ করত। সে তাঁদের কাছে বসে থাকত। তাঁদের ধর্মকথা শুনত।

সাধুদের মুখে সে শুনত: তুমি যদি ধর্ম পালন কর, তাহলে, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করবে। ধর্ম যদি না পালন কর, তাহলে, তুমি দুঃখ পাবে।

একজন তোমার প্রতি যে কাজ করলে, তোমার ভাল লাগে না, তুমিও তেমন কাজ অন্যের প্রতি করবে না।

এক নিমেষের জন্য হলেও আগুনের মত জ্ব'লে ওঠা ভালো।

কিন্তু চিরকাল ধোঁয়ার মতো হয়ে থাকা ভালো নয়।

দয়া করো। দান করো। দুষ্টের দমন করো।

এইসব ভালো কথা বা আলো কথা বালক গদাধরের খুব ভালো লাগত। ঐ সবে তার মনে যেন দেবভাবের ছোঁয়া লাগত। তার মানে—এক মহা ভাব জাগত। অশুভ ভাব তার কাছ থেকে দূরে ভাগত।

গদাধর কোন কোন সময়ে কি সব ভাবতে ভাবতে অজ্ঞানও হয়ে পড়ত।

বালক গদাধর ছিল নানা গুণের সাগর বা আকর।

সে দেবতার প্রতিমা তৈরী করা দেখেও দেব-প্রতিমা বানাত। এমন সুন্দর হত তার তৈরী প্রতিমা, যে তার যেন থাকত না কোন তুলনা বা উপমা।

বালক গদাধর ছিল যেন এক কবি। সে আঁকত সুন্দর সুন্দর ছবি। বিচিত্র চিত্র সে আঁকত। সেই সব সকলেরই খুব ভালো লাগত।

সাধুসন্তদের প্রতি, দেবতার প্রতি সেই বালকের ছিল ভক্তি।

তাই দেখে. লোকের মনে হত, সে যেন এই যুগের বালক ভক্ত প্রহ্লাদ, ভগবানকে ভক্তি করায় যার ছিল খুব আহ্লাদ। মানুষের মূর্তিধারী সে যেন আগেকার যুগের বালক ভক্ত ধ্রুব। সে যেন এক শুভ!

এই ভাবে পূজা অর্চনায়, গান গাওয়ায়, ছবি আঁকায়, দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করায় বালক গদাধরের দিন চলে যায়। তুচ্ছ দুষ্টামি-নষ্টামিতে তার দিন জলে যায় না।

একটু দুরন্ত ছিল বালক গদাধর। তার কখনো ছিল না ভয়ডর। সে কোন কোন সময়ে মেতে উঠত নানা রকম মজা

করায়, নানারূপ রসিকতায় ! হৈ-হল্লায় ।

গদাধরের ছিল আরো দুইটি ভাই। তারা ছিল তার চেয়ে বড়। তাদের একটির নাম রামকুমার। অপরটির নাম রামেশ্বর। তারা তিনটিতে মিলে ছিল যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

গদাধর হয়েছিল পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণির সেই যে তিনটি পুত্র, তারা যেন ছিল তিনটি নক্ষত্র। তারা যেন বাড়িতে করে তুলত একটি আনন্দের সত্র।

কিন্তু ইতিমধ্যে এক দিন গদাধরের বাবা ক্ষুদিরামের এল তাঁর জীবনের শেষ দিন। তাঁর শেষ শ্বাস উঠল। তাঁর প্রাণ তাঁর দেহ ছেড়ে কোথায় ছুটল !

জীবনের সেই শেষ ক্ষণে নির্ভীক রামোপম ক্ষুদিরামের কি মনে পড়েছিল কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত নিম্নোক্ত বাণীর মতো কোন বাণী ?

ওহে মৃত্যু ! তুমি মোরে কি দেখাও ভয় !
ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়।

তিনি কি মনে মনে লাভ করেছিলেন ইংরেজ লেখক সেক্সপীয়রের নিম্নোক্ত বাণীর ভাবের মতো কোন ভাব ?—

Cowards die many times before their death,
But the valiant never taste of death but once.—

প্রকৃত মৃত্যুর আগে কাপুরুষ মরে বহুবার ! সাহসীর মৃত্যু শুধু হয় মাত্র একবার।

কল কল করা গঙ্গার কূলে কলকাতায়

গদাধরের মানুষপিতা ক্ষুদিরাম আর নেই। কিন্তু পরম পিতা ঈশ্বর তো আছেন।—এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন গদাধর।

বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব। কিন্তু গদাধরের মনে দেব-ভাবের অভাব নেই।

গ্রামের যাত্রাগানে গদাধর শিব সাজেন। তখন তাঁকে দেখে লোকের মনে হয়, মহাদেব শিব যেন কৈলাস থেকে নেমে এসে তাদের মধ্যে 'রাজেন্দ্র' শোভা পান। গদাধর শিবের অভিনয় করে প্রশংসা পান।

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই গদাধরের হয় সমাধির অবস্থা। সে হয়ে পড়ে অজ্ঞান। তখন বন্ধ হয়ে যায় সেই যাত্রাগান।

দিন যায়। রাত যায়। গদাধর ক্রমেই সকলেরই বেশী করে আদর পায়।

এইবার তার উপনয়ন – পৈতা গ্রহণ। পবিত্র পৈতা গলায় পরে হিন্দু শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে গদাধর হল দ্বিজ—হল ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের কি কি গুণ থাকা চাই?

—ব্রাহ্মণের থাকা চাই সত্য, দান, বিবাদবিহীনতা, নিষ্ঠুরতা-বিহীনতা, এবং আরও কয়েকটি গুণ।

গদাধরের বড় ভাই রামকুমার দেখলেন, গ্রামের আয়-রোজগার দিয়ে সংসারের খরচপত্র আর চলছে না। বড় শহর কলিকাতায় গিয়ে কিছু রোজগার না করলেও চলছে না।

রামকুমার তখন এলেন কলিকাতায়। তাঁর সঙ্গে তার ছোট ভাইটি গদাধর। তার শরীরে কত রূপ! তার মনে ভাল ভাল ভাবের যেন স্তূপ! তাঁর বয়েস তখন বিশ বছরের ওপর।

কলিকাতা শহরের পত্তন করেন জবচার্ণক নামে এক ইংরেজ। মোটামুটি শ'চারেক বছর আগে। তখন সেখানে ছিল তিনটি গ্রাম, এখন সেখানেই রয়েছে কলিকাতা শহর আর তার কত জাঁকজমক, কত ধুমধাম! কত বাড়ী! কত গাড়ী! কত

নর! কত নারী। কাজ কারবার, জিনিসপত্র রকমারি। কলিকাতায় চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিরা নাচে-গায়। কলিকাতার জাদুঘরে তাক লাগানো কত কিছুই চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড গড়ের মাঠ। তার কাছেই কালীঘাট। গড়ের মাঠে রয়েছে ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ। রয়েছে শহীদ মিনার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আবহাওয়া অফিস, পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, রবীন্দ্রসেতু, কৃত্রিম হ্রদ, অনেক তলাওয়ালা বাড়ী, ট্রামগাড়ী,—এ সব তো কলকাতাতেই।

এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং আরও অনেক জ্ঞানী ও গুণী। এখানে গান গেয়েছেন পাঁচালী-কার কবি দাশরথি রায়, দেশপ্রেমী মুকুন্দ দাস। কবিতা রচনা করেছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে রাজনৈতিক কাজ করেছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আরও কত দেশপ্রেমিক মহান মানুষ।

রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুর পল্লীতে খুললেন একটি চতুষ্পাঠী—সংস্কৃত শেখার বিদ্যালয়। গদাধর যে খেয়ে-দেয়ে আর তাস খেলে দিন কাটাতে লাগলেন, তা নয়। তিনি গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে, নাথের বাগানে, এবং ঝামাপুকুরের বাসিন্দা, মিত্র মহাশয়দের বাড়িতে কিছু দিন দেবপূজার কাজ করলেন। কিন্তু পূজা ও পয়সা, এই দুইটির মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিল পূজা। পয়সা ছিল তাঁর কাছে যেন ছাই-পাঁশ।

এই সময়ে ঘটল এক ঘটামর ঘটনা।

পূণ্যবতী রাণী রাসমণি ছিলেন যেন বঙ্গের একটি মহামণি। তিনি কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে একটি দেব-মন্দির স্থাপন

করেন। তাতে তিনি খরচ করেন বেশ কয়েক লাখ টাকা !—সৎ কাজে টাকা ব্যয়, সেইটি পাকা কাজ হয়। দক্ষিণেশ্বরের সেই মন্দিরে স্থাপিত হয় কালী মাতার মূর্তি, দ্বাদশ শিব, আর রাধা-গোবিন্দের মূর্তি।

সেখানে রামকুমার হলেন সেই দেব-দেবীদের পূজার পুরোহিত। তিনি করতে লাগলেন তাঁর যজমানের হিত। ক্ষুদিরামের কুমার রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এলেন তাঁর ভাই গদাই—গদাধর।

ভক্তবর গদাধর কালীপূজার মন্ত্র শিখলেন। তাঁর মনের মধ্যেও হয় তো কালী মায়ের নাম লিখলেন।

গদাধর কালীমাতার প্রতিমাকে প্রতিদিন ফুলমালা পরাতেন। পরাতেন চমৎকার অলংকার। তখন তাঁর মনে ও মুখে বেজে উঠত 'মা, মা' ঝংকার। ঠিক যেন ওঁকার।

অল্পদিনের মধ্যেই, গদাধর রাণী রাসমণির এবং তাঁর আপন-জন মথুর বাবুর খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। কেন প্রিয় হয়ে উঠলেন ? প্রিয় হয়ে উঠলেন তাঁর সৎ ভাবের জন্য, সরলতার জন্য, দেবতার প্রতি ভক্তি ভাবের জন্য, কর্তব্য কাজে মন থাকার জন্য।

ঐ সময়ে গদাধরদের ভাগিনেয় হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে এলেন। গদাধর সর্বদাই পেতেন হৃদয়রামের আদর-সমাদর। এখন, দু'জনে মিলে হলেন যেন হরি-হর !

একবার রাধাগোবিন্দ মূর্তির পা ভেঙে গেল। তার ফলে, রাণী রাসমণির মনে একটা বিপদের আশঙ্কা হ'ল। কিন্তু গদাধর হলেন সেই ভাঙ্গা পা জোড়া লাগাবার সূত্রধর।

তিনি বললেন, রাধাগোবিন্দের পদ তো পরম পদ—সকলের

মঙ্গলের আস্পদ।—সেই পা কি ভাঙতে পারে!—সকলে সংযত রাখ, ভক্তিযুত রাখ আপনারে।

এইবার গদাধর হতে চাইলেন শক্তিধর। তিনি নিতে চাইলেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা।

কেনারাম ভট্টাচার্য হলেন গদাধরের দীক্ষা দানের আচার্য।

ইতিমধ্যে একদিন রামকুমার ইহলোক থেকে পরলোকে চলে গেলেন।

এ পর্যন্ত আমরা পেলাম রাম আর রাম ঃ ক্ষুদিরাম, রামকুমার, রামেশ্বর, হৃদয়রাম।

এইবার গদাধরকে আমরা পাব রামকৃষ্ণ ব'লে—শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে।

রামকৃষ্ণের ভক্তিভাব দেখে, মা কালীর প্রতিমার সম্মুখে তাঁর আত্মহারা ভাবভঙ্গী দেখে, অনেকের মনে হতে লাগল রামকৃষ্ণ হয়ে গেছেন এক পাগল।—কিন্তু আসলে তিনি তখন ভাঙছেন সংসারের মিছে মায়ার আগল। তিনি তখন পেতে চাইছেন অমৃতের স্বাদ—ভগবানকে লাভ করার আনন্দ-আহ্লাদ। —তিনি এখন সেই মহাভাবের বশে যেন উন্মাদ।

কিন্তু তখন তাঁর সেই ভাবভঙ্গী দেখে, কালীমাতার পূজা করার ভঙ্গী দেখে, রাণী রাসমণি, মথুরবাবু প্রভৃতিরা বুঝতে পেরেছিলেন,—এই গদাধর দ্বাপর যুগের সেই গদাধর—শ্রীকৃষ্ণ। এই যুবক যজ্ঞের পবিত্র পাবক। এই পুরুষের মধ্যে রয়েছে সেই পরম পুরুষের পৌরুষ।

দক্ষিণেশ্বরের সেই মহামন্দিরে হৃদয়রাম দেব-দেবীর পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞাতি ভাই রামতারক সেখানে পূজা করতেন।

রামকৃষ্ণ তাঁকে ডাকতেন হলধারী। তিনিও মানুষটি ছিলেন বেশ চমৎকারই।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী স্থাপিত হল—বেল, বট, আমলকী, অশ্বত্থ, অশোক,—এই পাঁচ গাছের মিলন মেলা সেখানে।

রামকৃষ্ণ নিবিড় আঁধার রাতে সেখানে বসে করতেন মা-কালীর ধ্যান। তখন তাঁর থাকত না বাহ্যজ্ঞান।

রামকৃষ্ণের সেই দিব্য ভাবের অবস্থায় হৃদয়রামের এখনও পুরোপুরি আস্থা নেই। তাই তিনি কোন কোন রাতে ঢিল ছুঁড়তেন রামকৃষ্ণের প্রতি। কিন্তু জগৎমাতার প্রতি মহামতি রামকৃষ্ণ তখন করছেন গতি।—ঢিল ছোঁড়ায় বা কিল মারায় তাঁর সেই মহাভাব কি ভেঙ্গে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব-দেবীর ভোগের অন্ন বিড়ালকেও খাওয়ান। তাই দেখে সবাই ব'লে ওঠে,—এ কি! এ কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ হয় তো তখন মনে মনে ব'লে ওঠেন, সকল কিছুর মধ্যে ভগবান আছেন, এই বিড়াল দিয়ে সেই ভাবটি আমি শিখি।

সাধুসন্ন্যাসীরা দক্ষিণেশ্বরে আসেন। নানা রকম ভালো কথা—আলোকথা বলেন। হঠযোগের কথা কেউ কেউ বলেন।

তাই শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণ হঠযোগ অভ্যাস করতে মন দিলেন। উদ্দেশ্য হল জগৎ-মাতার সঙ্গে বেশী করে যোগ স্থাপন করা, নিজেকে যুক্ত করা,—যা কিছু খারাপ, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

মা-কালীর মহা সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাগলের মতো ভাব-ভঙ্গী দিন দিন বেড়ে যায়। রামতারক ভাবেন, ভূতে ভর করেছে এর ঘাড়ে।—কি করলে এই ভূত একে ছাড়ে?

একদিন ভিখারীদের ভোজন করানো হচ্ছে। 'জয় মা! জয় মা কালী!' ধ্বনি উঠছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই সেই ভিখারীদের ভুক্তাবশিষ্ট কিছুটা ধ'রে পুরে দিলেন নিজের মুখের ভিতরে।

ব'লে উঠলেন,—স্পৃশ্য—অস্পৃশ্য ভাব দূর হয়ে যা! ছোট—বড়ভাব দূর হয়ে যা!—তুই কে? আমি কে? ও কে?—সবার মধ্যে দেখ এক ভগবানকে—দেখ সেই এককে!

সেই এক পরব্রহ্মকেই তো সৎ ব্রাহ্মণেরা নানা রকমে ব'লে থাকেন: একম্ সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।

সবার মধ্যেই রয়েছেন সেই এক ভগবান,—এইটি অনুভব করতে চান শ্রীরামকৃষ্ণ মতিমান, ভক্তিমান।

তাই তিনি এক হাতে ধরেন মাটি, আর হাতে ধরেন টাকা। বলেন,—টাকা মাটি—মাটি টাকা!—ধর্মের পথ চাই সোজা, চাই না বাঁকা।

ওর পরে সেই টাকা, সেই মাটি তিনি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলেন গঙ্গার জলে। তখন তাঁর চোখে মুখে যেন ব্রহ্ম-অনল জ্বলে!

সত্যিই তো,—টাকার লোভই তো মানুষের মনকে বাঁকা করে ফেলে। ছলনায়, ঈর্ষায়, হিংসায়, মিথ্যায় মাতিয়ে তোলে।

লোভবিহীন পুরুষ রাজা জনক বলেছিলেন, আমার এই মিথিলা রাজ্য একদম পুড়েও যদি যায়, তাতে আমার কি আসে যায়!

আমার রাজ্য এই মিথিলা আমার ভগবৎ-ভাবনাকে করতে পারবে না শিথিলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই খাঁটি ভগবৎভক্ত হয়ে উঠেছেন কিনা,

একদিন এল তার পরীক্ষার দিন।

ছলনাময়ীরা এল রামকৃষ্ণের কাছে। তারা নাচে। তারা হাসে। তারা যুবক শ্রীরামকৃষ্ণকে বাঁধতে চায় ময়লা মায়ার পাশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন হয়তো মনে মনে ব'লে উঠলেন,—আমি সেই যুবক, যে তোমারে মনে করে তুচ্ছ বক! তোদের ঐ যে রূপ, ও তো আসলে পাঁকে ভরা কূপ!

হয়ে যাও তোমরা সতী! সত্য ও শিবের দিকে হোক তোমাদের মতি ও গতি।

তারা গলায় প'রে ছিল ধার্মিক যুবক রামকৃষ্ণকে হারিয়ে দেওয়ার হার। কিন্তু সেই হার পবিত্র পুরুষ রামকৃষ্ণের কাছে মানল হার।

তারা চলে গেল। তাদের সব ফন্দি জ্বলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন,—ওরে মন, বলো 'মা কালী'। —দূর হবে মনের কালি। হয়ে থাকবি তুই অপূর্ব আলোকশালী চিরকালই।

জয়রামবাটীর জয়রামনন্দিনী সারদামণি

মা কালীর কোল লাভ করবার জন্য, তাঁর সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমান প্রায়ই করেন ক্রন্দন, তিনি হয়েছেন পাগলের মতন,—এই সংবাদটি কলকাতা থেকে লোকের মুখে মুখে চ'লে গেল দূরে কামারপুকুরে। পুত্রের ক্রন্দনের সংবাদ শুনে, গদাধরের মা চন্দ্রমণির প্রাণ কেঁদে উঠল। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা ছুটল। ক্রমে সেই খবরটিও কলকাতার দিকে ছুটল।

রামকৃষ্ণ শুনলেন তাঁর মমতাময়ী মাতার দুঃখের কথা।

তার কয়েকদিন পরেই, রামকৃষ্ণ এসে গেলেন কামারপুকুরে। কামারপুকুর তাঁর জন্মভূমি।

সুকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,—

"ধন্য, ধন্য জন্মভূমি—আনন্দ-ভবন!

নয়, নয় তুল্য তার নন্দন কানন!

স্বর্গ-স্বর্গ' করে লোকে—সার তার নাম।

প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।"

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় বলেছেন,—জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

মাতা চন্দ্রমণি তাঁর নয়নের মণি গদাধরকে দেখবার জন্য হয়েছিলেন আকুল। পুত্রকে কোলে পেয়ে তিনি যেন পেলেন সেই কূল, যে কূল অতুল!

কিন্তু কালী মাতার জন্য রামকৃষ্ণের আকুলতা-ব্যাকুলতার যে পাগল-পাগল ভাব, তা তো রামকৃষ্ণের যাচ্ছে না। সেই যুবক জগৎ-মাতাকে ছাড়া আর কিছু জানে না। চায় না!

গাঁয়ের লোকেরা চন্দ্রমণি দেবীকে বলল,—ওগো দিদি! ওগো বোন! আমাদের কথা শোনঃ গদাধরকে এখন বিয়ে করাও। নতুন বউ হবে যেন একবাটি মধু। তাই পেলেই ভাল হয়ে উঠবে আমাদের পাগলা-পাগলা গদা—আমাদের গদাই—গদাধর।

ঐ কথা যেন শান্তির জল ছিটিয়ে দিল চন্দ্রমণির দুঃখের আগুনের উপর!

তিনি ভাবলেন, হ্যাঁ, ঠিক!—এখন গদাধরকে করাতে হবে বিয়ে। তা হলেই, তাকে সংসারী করে তুলবে তার শ্বশুরের ঝিয়ে।

ঝিঁঝি পোকারা তখনই ঝংকার তুলল আশপাশের ঝোপে-ঝাড়ে।

রামকৃষ্ণের বিয়ের জন্য একটি ঝিয়ের সন্ধান চলতে লাগল।

ঘটক মশাই, এই বিয়ে ঘটাবার জন্য, মেয়ের সন্ধানে ঘাটে ঘাটে, মাঠে মাঠে, বাটে বাটে, বাড়ীতে বাড়ীতে ছুটতে লাগলেন। আর বেশ করে রসগোল্লা-সন্দেশ-দরবেশ-দানাদার লুটতে লাগলেন।

একটি গাঁয়ের নাম জয়রামবাটী। সেখানে আছেন জয়রাম মুখুজ্যে।—জয়রামবাটীতে জয়রাম। তাঁর আছে একটি শিশু মেয়ে। সে বেড়ায় নেচে-গেয়ে। তার নাম সারদামণি।—সে কি নানা গুণের খান?

সেই মেয়ের নাম আর রূপের বর্ণনা চলে এল দেবী চন্দ্রমণির কানে। তাঁর মন মন ভ'রে উঠল আনন্দের বানে!

শিশুকন্যা সারদামণিকে দেখলেন রামকৃষ্ণের পক্ষের কয়েক-জনে। তাঁদের মনে হল,—এই মেয়ের চোখ-মুখ-পা-হাত,—এ তো যেন চতুর্বর্গ একসাথ! ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ,—এই চারটিতে হয়েছে চতুর্বর্গ। এর মুখের কথা, মনে হয় যেন দেববালার বারতা!

গদাধরের সঙ্গে সারদামণির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

ছেলে-মেয়েরা গাঁয়ের পথে পথে চেঁচাতে লাগল :

বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে!

কার বেটা, কার ঝিয়ে?

সেই বিয়েতে কয়েক শ টাকা পণ দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল।

বিয়েতে পণ দেওয়া-নেওয়া কি ভালো? লোকে বলে,—বিয়েতে পণ দেয়া-নেয়া কাজটা বড় কালো! —খারাপ!

জয়রামবাটীর জয়রামের জামাই

সেটা তখন, বোধ হয়, মাস ছিল বৈশাখ। বেজে উঠল বিয়ের শাঁখ। ঢাক বাজে—টাক্‌ডুমটাক।

বাজে বিয়ের বাঁশি।

কতশত জনের মুখে ফোটে খুশির হাসি! খোকা-খুকীরা করে নাচানাচি।

গদাধরের বয়েস তখন হয়তো পঁচিশ বছরও নয়। সারদামণির বয়স ছয়-সাত বছর হয়-হয়।

বিয়ের আগে, পিতৃপুরুষদের করা হল পিণ্ড দান—করা হল শ্রাদ্ধ—জানানো হল শ্রদ্ধা।

বিয়ের রাতে গদাধর বিয়ের আসনে বসলেন। বসলেন সারদামণি। লোকে বলতে লাগল,—এতো যেন লক্ষ্মীনারায়ণ! যেন হর-গৌরী!—দুই সুন্দর-সুন্দরী!

করতে ঐ দুইটির হিত, বিয়ের মন্ত্র পড়ান পুরোহিত : ত্বমসি হৃদয়ং মম—তুমি আমার হৃদয়।—তুমি ছিলে আমার পর। এখন থেকে তুমি হলে আমার আপন।

ঘোরা হল সাতপাক। তখন বর-কনের উপর ফুলবৃষ্টি হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁক।

হল বর-কনের পাটে ওঠা।—সেই অনুষ্ঠানটা যেন একটা নাটে বা থিয়েটারে জোটা!

হল বর-কনের শুভদৃষ্টি। সেটা যেন আজকাল ছেলে-মেয়েরা যাকে বলে একটা 'ফিস্টি'!

বিয়েতে দানসামগ্রী কি দেওয়া হল?—দেওয়া হল সোনা-রূপা, কাপড়চোপড়, থালাবাসন-বাটি; দেওয়া হল শীতলপাটি।

বিয়ে হয়ে গেল। তারপরে হাস-তামাসাকরা ছেলে-মেয়েরা, রসিক-রসিকারা, ধরতে এল জামাইয়ের কান। কিন্তু ইতি মধ্যে জামাই মশাই তাদের পিঠে বসিয়ে দিলেন কয়েকটা কিল দুমদাম। তাদের রোল উঠল হাসির। তান বাজল বাঁশির।

ভোজ হল বরযাত্রীদের-কন্যাযাত্রীদের। ঠেসে ঠেসে খেয়ে খেয়ে, অনেকের পেট হয়ে উঠল যেন মস্ত বড় পিপে।

ওর একদিন পরে রাত্রে বউভাত। খাওয়া-দাওয়ায়, গানে-বাজনায়, হাসি-তামাসায়, সে যেন এক অফুরন্ত ফুর্তির ফোয়ারা!

বিয়ের পরে, সারদামণি মুখুজ্যে হয়ে গেলেন সারদামণি চাটুজ্যে। হলেন গদাই জয়রামবাটীর জয়রাম মুখুজ্যের জামাই।

হলেন সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী—অর্ধাঙ্গিনী—গৃহিণী—গিন্নি।

গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ বিয়ে করে হলেন যাকে বলে 'সংসারী'। কিন্তু খাওয়া-পরা, ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি,—এ সবে তিনি মন দিতে পারলেন না।—তিনি যে তাঁর মন আগেই জগৎমাতা মহাদেবীকে দিয়ে রেখেছেন।

তিনি তাঁর বধূ সারদার মধ্যেও সেই জগৎ-মাতাকেই দেখতে লাগলেন।—জগতের সব নারীই তো তখন তাঁর কাছে মা।

ভৈরবী—যেন স্বর্গের ছবি!

বিয়ের পরে, কামারপুকুর থেকে রামকৃষ্ণ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার তাঁর সেই পাগলা-পাগলা ভাব। সর্বদাই 'মা, মা' ব'লে তিনি ব্যাকুল।—কেন তিনি হবেন না ব্যাকুল?—তাঁর

হৃদয়ে যে ফুটেছে ভক্তি-ফুল। তাঁর মন 'মা, মা' ব'লে সর্বদাই গুনগুন করছে মৌমাছির মত।

রাণী রাসমণি নানা গুণের খনি। ইহলোক—অর্থাৎ, এ পৃথিবী, তাঁকে পেয়েছে। পেয়ে ধন্য হয়েছে। এইবার পরলোক বা যমলোক বা যমের বাড়ি তাঁকে পেতে চাইল।

তিনি অসুস্থ হলেন। আর সুস্থ হলেন না। মরণ তাঁর প্রাণটি নিয়ে অমর লোকের দিকে করল গমন—তিনি স্বর্গে গেলেন।

তিনি একদা শিশু হয়ে জন্মেছিলেন এই পৃথিবীতে। তখন তিনি কেঁদেছিলেন।

তারপর বড় হয়ে ওঠার পর নানারকম ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। মৃত্যুকে তুচ্ছ একটা ব্যাপার মনে করে হেসে-ছিলেন। তাই যখন তাঁর হল মরণ, তখন শত শত লোক দুঃখে করল ক্রন্দন।

এক সাধু পুরুষ সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তুমি যখন জন্মেছ, তখন তুমি কেঁদেছ, কিন্তু তোমাকে পেয়ে সকলে আনন্দ পেয়েছে, হেসেছে, শাঁখ বাজিয়েছে। তুমি সারা জীবন ভালো ভালো কাজ করো। পরের উপকার করো। তা হলে, মৃত্যুভয় তোমার থাকবে না। তুমি হাসতে হাসতে মরতে পারবে। কিন্তু তখন তোমার জন্য লোকে কাঁদবে।

হিন্দুদের ধর্মপুস্তকে বলে,—আত্মা জন্মগ্রহণ করে না, মরে না। আত্মা চিরকাল এক ভাবেই আছে এবং থাকবে। কোন অস্ত্র মানুষের আত্মাকে কেটে ফেলতে পারে না, পুড়ে ফেলতে পারে না! আত্মা অমর। সকলেই আসলে অমর।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ফুলবাগানে ফুল তুলছেন। মনে মনে

মা কালীর নাম করে আনন্দে একটু একটু দুলছেন।

তখন গঙ্গার কূলে এসে লাগল এক নৌকা। নৌকা থেকে নামলেন গেরুয়াপরা এক ভৈরবী। সে যেন এক স্বর্গের ছবি!

ভৈরবী কি—শিবের ভক্ত সন্ন্যাসিনীকে বলে ভৈরবী।

তাঁর রাশি রাশি চুল তাঁর মাথায় বাঁধিয়েছে যেন জুলস্থল। বয়েস তাঁর হবে চল্লিশ। কিন্তু দেখলে, মনে হয় যেন ত্রিশ।

তার পরে, ঘরের ভিতরে বসে, ভৈরব-রবে ভৈরবী কথা শুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে।—ধর্মের কথা, কর্মের কথা, ভক্তির কথা, মুক্তির কথা। সেখানে তখন ফুটল কত ভালো কথার আলো।

হিন্দুদের কোন কোন সংস্কৃত বইয়েতে বলা হয়েছে—ভগবানের অবতার দশটি। কোন কোন বইতে বলেছে, অবতার চব্বিশটি। ভগবান মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসবেন, একথাও বলা হয়েছে।

ভৈরবী বুঝলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের একটি অবতার বই কি!

ভৈরবী সেই কথা সকলকে বলতে লাগলেন। কিন্তু লোকে কি তা সহজে বিশ্বাস করে!

তখন খুব বড় একটি সভা বসানো হল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সেখানে এলেন। তখন ভৈরবী নানা রকম কথা বলে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ নন শুধু একজন দেবভক্ত মানুষ। তিনি ভগবানের একটি অবতার। কারুর সঙ্গে তুলনা নেই তাঁর।

এর পর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করলেন তন্ত্র সাধনা।

তন্ত্র কি?—শিব ও শক্তি সম্বন্ধীয় একপ্রকার উপাসনাবিধি।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে স্থাপন করা হল মরা মানুষের কঙ্কাল।

সেখানে রামকৃষ্ণের আরম্ভ হল সেই তন্ত্রসাধনা।

সেই সাধনায়, ভৈরবী পচা মৃতদেহের মাংসও শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে পুরে দিয়েছিলেন, একথা বলা হয়।

তন্ত্রসাধনা সহজ নয়, কঠিন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। তাতে তাঁর সময় লাগল মাত্র তিন দিন।

পশু-পাখিরা শব্দ করে করে কি যে বলে, মানুষে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু তা বুঝবার শক্তি লাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঈশ্বরকে লাভ করবার পথ আছে অনেক রকম। নানা নামের নদী সাগরের দিকে যায়। এক এক মানুষ এক এক ভাবে সাধনা ক'রে ভগবানকে পায়।

মহাসাধু শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এক ভাবেই সাধনা করলেন না। সাধনা করলেন অনেক ভাবে।

একবার এক জটাধারী সাধু এলেন সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর সাথে রামায়ণের রামের একটি শিশু মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রামবিগ্রহের সেবা করতে লাগলেন। জটাধারী সাধুটি মন্ত্র দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের সাধনাও করলেন। নারীর বেশ ধারণ করেও শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করলেন তিনি।

মথুরবাবুর বাড়ীর ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি স্ত্রীলোকের মতো রইলেন কিছু দিন। শ্রীরাধার ধ্যানও তিনি করলেন কিছু কাল ধ'রে।

শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধার দর্শন পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরা তাঁকে দেখা দিলেন। তারপর তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন।

প্রেম, দয়া, সখার ভাব, ভৃত্যের ভাব, স্নেহের ভাব প্রভৃতি

অনেকগুলি ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

একদিন ধর্মপুস্তক ভাগবত পাঠ করা হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ তা শুনছেন। হঠাৎ এক আলোকময় পুরুষকে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই পুরুষের পা থেকে বেরুল বিদ্যুৎ।—ওঃ। সে কী অদ্ভুত! সে কী অদ্ভুত!—সেই বিদ্যুৎ প্রবেশ করল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে।

দেবী চন্দ্রমণি তাঁর মহামণির মতো পুত্রটির কাছে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারী হওয়ার উপদেশ দিলেন।

কিন্তু সংসারের যা সার—সেই সারাৎসার ভগবানকে শ্রীরামকৃষ্ণ চান।—তিনি কি সাধারণ সংসারী বিষয়ে করতে পারেন মনোযোগ দান!—তাঁর মনোযোগ আগেকার মতোই থাকল ঈশ্বরের দিকে। নশ্বরের দিকে নয়—যা চিরস্থায়ী নয়, তার দিকে নয়।

একদিন মথুর বললেন চন্দ্রমণি দেবীকে, ওগো দিদিমা। তুমি আমার কাছে কিছু চাও।—তোমাকে কিছু দেবার সুযোগ আমাকে দাও।

চন্দ্রমণি ব'লে উঠলেন, দাঁত মাজার কিছু তামাক আনাও। তাই আমাকে দাও।

লাখলাখ টাকার মালিক সেই মথুর। তাঁর কাছে চন্দ্রমণি চাইলেন মাত্র কয়েক পয়সার তামাক। সোনা নয়, রূপা নয়, জমি নয়, বাড়ী-গাড়ী নয়, চাই সামান্য তামাক!

মথুর তখন হলেন অবাক। নিলেন চন্দ্রমণির পায়ের ধূলো। সেই ধূলি তাঁর কাছে মনে হল যেন সোনার কণাগুলি!

তোতাপুরী—যেন এক পবিত্র পুরী।

মহাসাধু তোতাপুরী

ভারতের তীর্থে তীর্থে,
আনন্দের নৃত্যে নৃত্যে,
ঘুরি' ঘুরি', ফিরি' ফিরি',
এলেন দক্ষিণেশ্বরে,
রামকৃষ্ণে দেখিবার তরে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তোতাপুরী বললেন,—পৈতা ছাড়তে হবে। বেদান্ত মতে সাধনা করতে হবে। সন্ন্যাস নিতে হবে!

সেই তোতাপুরী জটাধারী, লম্বা, ল্যাংটা। কিন্তু 'বেদান্ত' কি?—বেদান্ত হল বেদের শেষ ভাগ, উপনিষৎ,—এক প্রকার শাস্ত্র।

তোতাপুরীর কাছে রামকৃষ্ণ দীক্ষা নিলেন। তোতাপুরী এক টুকরো ভাঙা কাচ বিঁধিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূর ভিতরে। বললেন সেই তোতা, হে রামকৃষ্ণ! তোমার মনকে এই বিন্দুতে বন্দী করো—একাগ্র করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই একাগ্রতা লাভ করতে করতে সমাধিস্থ হলেন। অচেতন অবস্থায় চলে গেল তিন দিন।—তখন তাঁর হৃদয়ে বাজছিল কি ভক্তিভাবের বীণ?

একবার এলেন এক ফকির। তাঁর ভিতরে ছিল না কোন রকম ফিকির। তিনি ছিলেন আল্লার ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাথে ধর্মবিষয়ে নানারূপ আলোচনা

করলেন। শেষ পর্যন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটে উঠল 'আল্লা, আল্লা' শব্দ। সেই ফিকিরহীন ফকির শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনালেন মুসলিম ধর্মপুস্তক কোরাণ-এর মন্ত্র ঃ

লায়েলাহা ইল্লাল লাহা
মোহাম্মাদর রসুলুল্লাহ্।

—আল্লা এক। তাঁর কোন শরিক নেই। মোহাম্মদ আল্লার প্রিয় দোস্ত।

ফিকিরবিহীন ফকির বললেন,—আল্লার গজবকে (ক্রোধকে) ভয় করো।

তুরীয়তৃষ্ণ বা ব্রহ্মতৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলিম ধর্ম-অনুসারে নামাজ পড়লেন।

সাধুসন্তদের মুখের কথায় অনেকের রোগ সেরে যায়,— এরূপ শোনা যায়।

একবার মথুরবাবুর স্ত্রী অসুস্থ হলেন।

তাই শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যিনি রোগের জন্য হয়েছেন এখন দুঃস্থ, তিনি শীগ্গিরই হবেন সুস্থ।

হলও ঠিক তাই।—সাধুর মুখের কথার তো অন্যথা হবার জো নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার কলকাতা থেকে আবার কামারপুকুরে।

জয়রামবাটীতে গেল সেই সংবাদ। তাই শুনে দেবী সারদামণির তখন কতই আহ্লাদ!

তিনি এলেন কামারপুকুরে। দেখলেন তাঁর প্রভুরে—তাঁর প্রাণের ঠাকুরে তাঁর স্বামীটিরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে আবার কলকাতায়—দক্ষিণেশ্বরে।

মহান মানুষ মথুর বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, তীর্থে যেতে চাই। পথের মহাসম্বল সাথে থাকা চাই।—আমার সেই সম্বল এই—তুমি, হে পূজনীয় প্রভু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তীর্থ দর্শন তো করাই চাই। কিন্তু পবিত্র ভাব দিয়ে ভ'রে মানুষেরই নিজের জীবনকেই তীর্থ করে তুলতে হবে।—তা না হলে, তীর্থে গিয়ে কী হবে! দেবতাকে—দেব-ভাবকে—কেবল তীর্থে থাকতে না দিও। তাকে নিজের চিত্তে বেঁধে রেখে, চিত্তকে তীর্থ ক'রে নিও।

তীর্থে গেলে পুণ্য হয়

ভক্ত মথুরবাবু নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিতে চাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাজী হলেন, খুশী হলেন।

তীর্থে যায়, পুণ্য পায়,—এই কথা তো লোকে বলে।

মথুরবাবুর সঙ্গী হলেন অনেক লোক।

ভারতে আছে কত শত তীর্থ ঃ

কালীঘাট, পুরী, কাশী, কামাখ্যা, হরিদ্বার, দ্বারকা, বদরিকা, সোমনাথ, গয়া আর—আরও আছে কত কত।

মহাতীর্থ কাশী। তার আর একনাম বারাণসী। সেখানে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, হৃদয়রাম, মথুর প্রভৃতি।

গঙ্গায় স্নান করা হল। বিশ্বনাথ শিবের মূর্তি দর্শন করা হল।

গঙ্গার কূলে মণিকর্ণিকা ঘাট। সেখানে সর্বদা হচ্ছে নানা মন্ত্রপাঠ।

সেইখানে মহা সাধু তৈলঙ্গ স্বামীজী। তিনি কথা কন না।

কারুর কাছে কিছু চান না।

তিনি ধ্যান করেন। সবকিছুই ব্রহ্মময় বলে মনে করেন।

সাধু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাধুকে দেখলেন।

সবাই গেলেন বৃন্দাবন তীর্থে।

সেখানে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ মেতেছিলেন নৃত্যে।

সেখানে রাধাকুঞ্জ, শ্যামকুঞ্জ। ফুল সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ—রাশি-রাশি।

বেশ কিছু দিন পরে ফিরলেন তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধু—খুব বড় সাধু। তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তিনি পরমহংস। এই কথা বলতে লাগল নানা জায়গায় নানা লোকে।

কিন্তু 'পরমহংস' কি? কাকে বলে 'পরমহংস'?

—যাঁর মনে খারাপ ভাব নেই, যার মন সংযত, যার কোন বিকার নেই, যিনি যোগী, যিনি ভগবানের আনন্দে মেতে আছেন, তাঁকে বলা হয় পরমহংস। সোজা কথায় বলা যায়ঃ অতি বড় সাধু।

সেই কামারপুকুর গ্রামের গরীবের ছেলে গদাধর। তাঁর গুণের জন্য এখন তাকে সবাই বলতে লাগল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।—ধন্য পুরুষ! ধন্য পুরুষ!

কত তাঁর নাম-ডাক। কত বড় বড় লোক তাঁর কাছে আসে। তাঁর উপদেশ পেতে চায়। তাঁর পায়ের ধুলো পেতে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কত ভালো ভালো কথা বলেন। উপদেশ দেওয়ার জন্য কত গল্প বলেন।

পরমহংসদেব বলেন,—ভগবানকে পেতে চাও? তা হলে ভালো কাজ করে যাও।

যদি করো পরের ক্ষতি, তাহলে তোমার হবে দুর্গতি।—তুমি দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনেক নাটক রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন মহাকবি।

তিনি হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্ত।

সেই গুরু সেই ভক্তকে বলেছিলেন,—যা করছ, করো। কিন্তু দিনে-রাতে ভগবানকেও একটু স্মরণ কোরো।

রানীর গালে চড়

শ্রীরামকৃষ্ণকে লোকে বলে পরমহংস,—অর্থাৎ, ভগবানের অংশ। সে কথা যে সত্যি, সেই সম্বন্ধে একটা ঘটনা আছে চমৎকার।

একদিন রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে ব'সে দেবতার ধ্যান করছেন—চিন্তা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বসে আছেন রানী রাসমণির কাছে। তিনিও ভক্তির ভাবে বিভোর।

হঠাৎ পরমহংস দেব রানীর দিকে স্থির চোখে চাইলেন।

অমনি পরমহংসদেবের হাতের একটা চড় ঠাস করে পড়ল রানীর গালের উপর।

রানীর চাকরবাকরেরা কাছেই ছিল। তারা ছুটে এল।—পরমহংসের সাধুগিরি বুঝি এবার ছুটে গেল!—

রানীর গালে চড় মারল ঐ বামুন!

—কী আস্পর্ধা ওর!—এই সব কথা তারা বলতে লাগল।

কিন্তু চড়-খাওয়া রানীর মুখে দেখা গেল দুঃখের ভাব আর লজ্জার ভাব।

কেন ?

—রানী দেবতার ধ্যানে বসেও বিষয়-পসার, টাকা-কড়ির কথা ভাবছিলেন। আর পরমহংসদেব রানীর মনের সেই কথা জানতে পেরেছিলেন নিজের ধর্মশক্তির বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ যেন স্বর্গের সন্দেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছ থেকে কত উপদেশ লোকে পেয়েছে। সেই সব উপদেশ যেন স্বর্গের সন্দেশ !

একবার এক সাধু এলেন এক গাঁয়ে। তিনি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করলেন। অনেকটা খাবার পেলেন, তারপর দেখা গেল, একটা নোংরা কুকুরের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করে তিনি সেই খাদ্য খাচ্ছেন।

লোকে বলে উঠল,—এ কি করছ, সাধুবাবা ! তুমি কি পাগল ?

সাধু বলে উঠলেন, আমি ভগবানকে পাওয়ার জন্য পাগল ! —এই খাদ্যের মধ্যে ভগবান আছেন। এই কুকুরের মধ্যেও ভগবান আছেন। ভগবান আছেন তোমাদের মধ্যে, আমার মধ্যে। —সবকিছুই ভগবানকে দিয়ে ভরা।—এমন কিছু নেই, যার মধ্যে ভগবান নেই।—সুতরাং, কুকুরের সঙ্গে একসাথে খাচ্ছি ব'লে, হাসবার কিছু নেই।

ভগবান আছেন এতে, ওতে, তাতে।

ভগবান আছেন এখানে, ওখানে, সবখানে।

সাধুর সঙ্গে মিশলে, সাধুভাব ধর্মভাব মনে আসে।

একটি লোক একটা মেড়াকে খুব ভালোবাসত।

এক সাধু একদিন সেই লোকটিকে বললেন,—তুমি এক মনে ঐ মেড়ার সেবা কর। ওকে ভালোবাস। তা হলেই ভগবানকে ভালবাসা হবে।

লোকটি ভাবল —ঐ মেড়ার ভিতরে আছেন ভগবান। আমি ঐ মেড়াকেই ভালোবাসব দিয়ে আমার মন-প্রাণ।

তাই সে করলো। তার পরে ক্রমে ক্রমে সেই মেড়ার মধ্যে সে দেখতে পেল এক জ্যোতি।

একবার এক অবাঙ্গালী ধনী লোক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন।

তিনি পরমহংস দেবের নানারকম উপদেশ শুনলেন। খুব খুশী হলেন। তারপর বললেন,—ঠাকুর, আমি আপনার সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই এমন একটা ভাব দেখালেন যে, সেই ভাবটার অর্থ হল: আমার কাছে তোমার ঠাঁই নাই—তুমি চ'লে যাও।

দেখতে ও শিখতে

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মভাবের কথা ছড়িয়ে পড়েছে নানা জায়গায়। তাই কত লোকে তাঁকে দেখতে চায়, তাঁর মুখের কথা শুনতে চায়।

আসেন কবিরা। আসে অকবিরা। আসেন পণ্ডিতেরা। আসে মূর্খরা।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানতেন। তিনি

ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভালো ভালো কবিতার বই লিখেছেন। তিনি হিন্দুধর্ম ছেড়েছেন খৃষ্টান হয়েছেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে 'মাইকেল'। ঐটি একটি ইংরেজী ও খৃষ্টানী নাম।

হিন্দুধর্ম তিনি কেন ছাড়লেন ?—এই কথার উত্তরে তিনি বললেন,—পেটের দায়ে, ধর্ম ছেড়েছি।

তাই শুনে কেউ কেউ ব'লে উঠল, ছিঃ! ছিঃ!—ছিঃ!

নারায়ণ শাস্ত্রী—মস্ত বড় বিদ্বান। তিনি খুব ধার্মিকও।

তিনি এলেন পরমহংসদেবের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে, তিনি বুঝলেন, এই সাধুর মধ্যে খুবই ধর্মভাব আছে। এই সাধু শুধু নিজের ভালো হলেই খুশী নন। ইনি চান সকল মানুষের ভাল করতে।

যাকে বলে লেখাপড়া জানা, তা শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন কিছু ছিল না।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী, খুব বেশী লেখাপড়া জানা লোক হয়েও, হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত। ধর্ম-বিষয়ে নারায়ণ শাস্ত্রী চাইলেন রামকৃষ্ণের উপদেশ, অনুগ্রহ।

সেই শাস্ত্রীকে আসল ধর্মশাস্ত্র জানাতে লাগলেন শাস্ত্র-না-জানা পরমহংসদেব।

বর্ধমানে বড় সভা

বর্ধমানের রাজবাড়ী। সেখানে পাহারা দেয় পালোয়ান অস্ত্রধারী। কী জমকালো তার গোঁফদাড়ি!

সেই বাড়ীতে একবার বসল এক সভা।—ধর্ম বিষয়ের সভা।

বিষ্ণু বড় দেবতা, না, শিব বড় দেবতা,—এই নিয়ে সেই সভায় তর্ক-বিতর্ক।

সেখানে বসেছেন কত পণ্ডিত। তাঁদের কারুর কারুর কপালে ফোঁটা, মাথায় জটা, গলায় নানা রঙের মালার ঘটা।

সেখানে তখন রয়েছেন পণ্ডিত পদ্মলোচন। অনেক পণ্ডিতের আসনের চেয়ে বড় তাঁর আসন।

তিনি বললেন,—শিব বড়, বিষ্ণু বড়।—এই দুইটির কাউকে ছোট বা বড় বলে মনে না কর।

পণ্ডিত পদ্মলোচন এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার তরে।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলেন।

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ধর্মের দিকে সব সময়ে তাঁর মতি ও গতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হল। এঁর প্রতি ওঁর প্রীতি হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ যেন একটি দীপ—একটি বাতি। কতই তার ধর্মের ভাতি বা আলো। সে আলো কতই জমকালো!

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাখেলার স্থান।

নবদ্বীপ অনেক বিদ্বান লোকেরও বাসস্থান।

কলকাতায় কলুটোলায় হরিসভায়

একবার কলকাতায় কলুটোলায় হরিসভা হচ্ছে।

বাজছে করতাল ও খোল।

উঠছে রোল : হরি বোল ! হরি বোল !

পরমহংসদেব গেলেন সেই সভায়।

সেখানে তখন রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের আসন। কিন্তু সে আসন শূন্য তখন।

পরমহংসদেব সেই আসনই অধিকার করলেন। তারপর তাঁর সে কী নাচ !

মুখে উঠছে শুধু হরিনাম। আর তাঁর দুইটি পা করছে নাচের ধুমধাম।

নাচ ক'রে, নাচ ক'রে, বলেন হরিবোল উচ্চ স্বরে !

পণ্ডিতবর শশধর—মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতপ্রবর শশধরের নাম যশের কথা শুনলেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরম পণ্ডিতের সাথে দেখা করতে গেলেন।

দু'জনের মধ্যে ধর্মকথা হল নানারকম। ইনিও জানলেন কিছু নতুন রকম। উনিও জানলেন কিছু নতুন রকম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন. পণ্ডিত শশধর ধর্মধর।—ধর্মের দিকে মন তাঁর নিরন্তর।

পণ্ডিত শশধর বুঝলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃততৃষ্ণ—ভগবানকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—কেশচন্দ্র সেন ভালো ভালো কথা লিখতেন, ভালো ভালো কাজ করতেন, ধর্ম প্রচার করতেন, বক্তৃতা দিতেন।

তাঁর মতো বড় বক্তা খুব কমই দেখা যায়। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে বলত 'ব্রহ্মানন্দ'—ব্রহ্ম + আনন্দ।

তিনি তখন রয়েছেন কলকাতার কাছে বেলঘরিয়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন কেশবচন্দ্রের কাছে।

দুই জনের মধ্যে কত ধর্ম কথা হল! ব্রহ্মানন্দ কেশব খুবই আনন্দ পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন এক মহান সৎপুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুখ-শান্তি।

তখন থেকে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতে লাগলেন।

দুইজন হলেন যেন এ উহার পরম আপন জন!

কালনায় ভগবান—বর্ধমান জেলায় কালনায় ভগবানকে দেখা যায়, পাওয়া যায়, —এরকম কথা অনেকে বলত।

ভগবান—ভগবানদাস বাবাজী। তিনি ছিলেন যেন ধর্মভাবের ফুলের সাজি! কত লোক তাঁর কাছে আসত! তাঁকে ভক্তি করত, ভালোবাসত।

ধর্মভাবে ভরা হৃদয় নিয়ে মথুরবাবুকে আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গেলেন কালনায়।

সেই ভগবান ও শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা-সাক্ষাৎ হল। হল কতই ধর্মকথা, কর্মকথা!

ঈশ্বরের সঙ্গে—ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে বিখ্যাত হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভালো ভালো বই লিখেছেন! কত শত মানুষের উপকার করেছেন! কত বিদ্যালয় বসিয়েছেন! বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত,—এ কথা প্রচার করেছেন! তিনি হন নি 'বাবু'—হন নি বিলাসিতার ভাবে কাবু।

তিনি ঢেউভরা দামোদর নদী সাঁতার কেটে পার হয়েছেন। নিজের ঘরে বাতি না থাকায়, রাস্তার পাশের আলোকে বই পড়ে, পড়া শিখেছেন।

তিনি কোন ক্ষমতাওয়ালা লোকের খারাপ ব্যবহারকে মেনে নেন নি। রেখেছেন নিজের মান, দেশের মান, জাতির মান। তাই তো তিনি হয়েছিলেন মহান!

তিনি খুব ভালো ছিলেন বলে, লোকে আজও তাঁর নাম বলে।

রামকৃষ্ণ গেলেন ঈশ্বরের বাড়ীতে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখেই, রামকৃষ্ণ ব'লে উঠলেন, সাগরে এলাম!

বিদ্যাসাগর ব'লে উঠলেন,—সাগরের নোনা জল কিছুটা নিয়ে যান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক বিদ্যা। তবু তিনি সেই ধুতিপরা, জুতাপরা পরমহংসের কাছ থেকে সেদিন নূতন কিছু বিদ্যালাভ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তিনি লিখেছেন 'বন্দে মাতরম্' গান। লিখেছেন অনেক উপন্যাস। তিনি একজন খুব বড় লেখক।

বঙ্কিম করেন সাহিত্য-স্মৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখেন মা কালীর প্রতি দৃষ্টি। দুই জনের ঐ দুই ভাবই বেশ মিষ্টি!

কলকাতায় দেখা হল ঐ দুই জনের। কত ভালো ভালো কথা হল। তা থেকে বঙ্কিম যেন পেলেন নূতন আলোক, পরমহংসও পেলেন পুলক। আলোকে-পুলকে মাতলেন দুইটি মহান মানুষ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছিলেন যেন অনেকের মাথার ঠাকুর! তিনি ছিলেন বিদ্বান, ছিলেন দাতা, ছিলেন সুলেখক, ও ধর্ম-প্রচারক। লোকে তাঁকে বলে 'মহর্ষি'—মহাঋষি।

সেই মহর্ষির সাথে মহাসাধু রামকৃষ্ণের কথাবার্তা হল একদিন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন ধর্মগ্রন্থ বেদের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ধর্মবোধের কথা।

সাধারণ হয়ে উঠল অসাধারণ

কলকাতায় বাঙালীর বাড়ীতে থাকত অবাঙালী এক ছেলে। তার নাম রাখতুরাম।

সে বাঙালীর বাড়িতে চাকর ছিল। কিন্তু বাঙালীর হাতের রান্নাকরা কোন কিছুই সে খেত না।

সেই যে রাখতুরাম, সাধু সন্ন্যাসীর উপর তার ছিল খুব টান। সবাই তাকে ডাকত লেটো ব'লে।

লেটো শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, সে কথাও সে জানল।

লেটো একদিন কলকাতা থেকে চ'লে গেল দক্ষিণেশ্বরে। হেঁটেই গেল।

সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেখা পেল। পদধূলি পেল আশীর্বাদ পেল।

পরমহংসদেব সেই সামান্য ছেলেকে কতই সমাদর করলেন!

লেটো তখন খুবই খুশী।

তারপর সে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গাড়িভাড়া বা নৌকাভাড়া দিতে চাইলেন।

কিন্তু লেটো তা কিছুতেই গ্রহণ করল না। সে বলল, পয়সা তো আমার কাছে রয়েছে। পয়সা নেওয়ার আর কি দরকার আছে!

সেই অবাঙালী লেটো, শেষ পর্যন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ভক্ত হয়ে পড়ল।

পরবর্তীকালে তাঁর নাম হয়েছিল অদ্ভুতানন্দ। তিনি হয়েছিলেন বিশিষ্ট একজন সাধুপুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাধারণ লোককে করে তুলেছিলেন অসাধারণ।

অঘোরমণি ঠাকুরাণী

এক ব্রাহ্মণী, নাম অঘোরমণি। তিনি থাকতেন দক্ষিণেশ্বর থেকে অল্প কিছু দূরে।

তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে নেই। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভক্তি খুবই আছে।

তিনি গোপাল বা শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করতেন—সাধনা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণের সাধনাকারিণী সেই অঘোরমণি ঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা পেলেন। খুশী হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ঠাকুরাণীকে একদিন বললেন, তোমার তৈরী নারকোলের নাড়ু খেতে চাই। চাই তোমার রান্নাকরা ডাঁটা চচ্চড়ি, লাউশাক। সেই কথা শুনে অঘোরমণি তো একদম অবাক!

তারপর অঘোরমণি ঠাকুরাণী সেই চচ্চড়ি একদিন আনলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর তাই খেলেন। বললেন, তোমার রান্নাকরা চচ্চড়ির তো বেশ স্বাদ আছে!

সেই অঘোরমণিকে লোকে ডাকতে লাগল গোপালের মা ব'লে।

নরেন্দ্র হলেন বিবেকানন্দ

কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এক যুবক।

যুবকটি লেখাপড়ায় ভালো। মাঠে খেলাধূলায়ও ভালো। সে গরীব-দুঃখীর উপকার করে। তাদের ঘরে জ্বালায় আনন্দের আলো!

সে এলো দক্ষিণেশ্বরে। বসল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, তাঁকে প্রণাম ক'রে।

নানা রকম ধর্মকথা হতে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন। তখনই নরেন্দ্রনাথ কি এক রকম মহা হর্ষ অনুভব করলেন।

ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ হলেন পরমহংসদেবের মহা ভক্ত, মহা শিষ্য।

তখন থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ যুবক বয়সে আমেরিকায় গেলেন। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার করলেন। সকলের কাছে খুব নাম-যশ ও শ্রদ্ধা পেলেন।

তিনি ইউরোপের নানা জায়গায় বক্তৃতা দিলেন ধর্ম সম্বন্ধে। পূর্ণ হল সেই মহাদেশ হিন্দু ধর্মের পবিত্রতার গন্ধে।

স্বামীজী কলকাতার কাছে বেলুড় নামক জায়গায় মঠ স্থাপন করলেন। তিনি সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বিবেকানন্দ ভারতের লোকদেরে বললেন, গরীব-দুঃখীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা কর। যাদেরে বলা হয় অস্পৃশ্য, তারা হোক আমাদের স্পৃশ্য। ছুঁৎমার্গ ছাড়ো। সাধারণ লোকদেরে লেখাপড়া শেখায় উৎসাহ দাও, সাহায্য কর।

তোমরা নিজেদেরে দুর্বল ব'লে মনে কোরো না। তোমাদের ভিতরে অনেক শক্তি আছে। চেষ্টা করে সেই শক্তিকে জাগাও, ভারতের ভালো কাজে লাগাও!

গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে যাও। সেখানে লোকদেরে ভালো কথা শোনাও। ভালো কাজ ক'রে ভালো হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাও।

যে হয় পুরুষ, তার থাকা চাই পৌরুষ! যে হয় স্ত্রীলোক, তার ভিতরে থাকা চাই বিদ্যার আলোক, নানা গুণের আলোক!

ভারতবাসী যদি করে নানারকম ভালো ইচ্ছা ও চেষ্টা, তা হলে উন্নত হয়ে উঠবে এই ভারত দেশটা।

স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বই লিখেছেন। তিনি গান গাইতেন, বক্তৃতা দিতেন, গরীব-দুঃখীর সেবা করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এক ভালো ছেলে। তিনি তাঁর কাজ ক'রে গেছেন ভারতের ভালো করার ভালো কাজের আলো জ্বেলে; গুণের আগুন জ্বেলে!

স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে ছিলেন অল্প কয়েক বছর। কিন্তু তাঁর ভালো ভালো কাজের সুফল লোকে ভোগ করবে অনেক অনেক বছর!

স্বামী বিবেকানন্দ বাজিয়েছেন ধর্মের ঢাক। তিনি মানুষকে দিয়েছেন ডাক: ওরে, তোরা ভগবানকে ডাক আর সাহসী হতে থাক, বিদ্বান হতে থাক, নানা কাজের কর্মী হতে থাক। মনে-প্রাণে উৎসাহ রাখ! উৎসাহ রাখ!

গল্পের যেন কল্পতরু

কল্পতরু কাকে বলে ?

যে তরুর বা গাছের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়, তাকে বলে কল্পতরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন তখন কথায় কথায় অনেক ভালো ভালো গল্প বলেছেন। সেই সকল গল্প ব'লে তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। তাই তাঁকে বলা যায়,—গল্পের যেন কল্পতরু!

আমাদের ভারতে ভালো ভালো গল্পের বই আছে। সংস্কৃত ভাষায় আছে : কথা সরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন

হিন্দী ভাষায় আছে : বীরবলের গল্প।

তেলেগু ভাষায় আছে : তেনালী রামণের গল্প।

বাংলায় আছে : গোপাল ভাঁড়ের গল্প।

ঐ সকল গল্প পড়তে খুবই ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পও চমৎকার।

নানারকম রসের ও উপদেশের ভাণ্ডার।

থেমোনা, থেমোনা! এগোও, এগোও!

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি ?— মানুষের কি করা উচিত ?
—এই কথার উত্তরে. শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বললেন একটি গল্প।

একদিন একটি লোক কাঠ কাটবে ব'লে বনের ভিতরে গেল চলে।

তখন সে এক ব্রহ্মচারীকে দেখল। ব্রহ্মচারীটি সেই লোকটিকে বললেন ওহে, তুমি এগিয়ে যাও—সামনের দিকে যাও।

তখন সেই লোক আরও এগিয়ে গেল। তার পর অনেকগুলো চন্দনগাছ দেখতে পেল। সে অনেক চন্দন কাঠ নিয়ে বাড়ী ফিরল। সে সব বিক্রি ক'রে অনেক টাকা পেল।

কিন্তু ঐ করেই সে থামল না। সে ব্রহ্মচারীর সেই 'এগিয়ে যাও' উপদেশ স্মরণ করে, আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এবার সে পেল রূপোর খনি।

তার কিছু দিন পরে আরও এগিয়ে গেল। এবার সোনার খনি পেল।

ঐ ভাবে, সে মস্ত বড় ধনী হয়ে গেল।

সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে : যে লোক শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে।—তার কোন উন্নতি হয় না।

যে লোক দৌড়ায়, তার ভাগ্যও দৌড়ায় —সে উন্নতি লাভ করে। সুখী হয়।

"খুঁজিবার, বুঝিবার শক্তি যার আছে,
বসুধা বসুদা হয় সে জনের কাছে।"

—অমৃত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাচ্চাকে সাচ্চা কর

একটি লোক পাহাড়ের ধারে ভেড়া চরাত। সে একদিন একটি সিংহের বাচ্চা পেল। সে সেটিকে বাড়ি নিয়ে এল।

সেই সিংহের বাচ্চা ভেড়ার সাথে মিশতে লাগল। ভেড়ার হাবভাব, চালচলন শিখতে লাগল। ভেড়ার খাবার—ঘাস, খড়কুটো, ভুষি খেতে লাগল।

একদিন ভীষণ এক সিংহ সেই ভেড়ার পালের কাছে এসে

পড়ল। সিংহকে দেখে, ভেড়াগুলো দৌড় মারল। সিংহের বাচ্চাও মারল দৌড়।

কিন্তু সিংহ সেই বাচ্চা সিংহকে ধ'রে ফেলল। নিজের বাসায় নিয়ে গেল। সে সেই বাচ্চাকে বলল, মাংস খা! মাংস খা!

বাচ্চা সিংহ ব'লে উঠল, মাংস খাব না, মাংস খাব না!

খাই না। খাই না! আমি খাই ঘাস, আর ভেড়ার সঙ্গে মিশে করি নাচ!

সিংহ ব'লে উঠল, তুমি নওকো ভেড়ার বাচ্চা। তুমি সাচ্চা সিংহের বাচ্চা। তোমার চাই সিংহের মতো শিক্ষা, সাচ্চা এবং আচ্ছা।

কিন্তু ভেড়ার দলে মিশে বড় হয়ে উঠেছে যে সিংহের বাচ্চা, সে কি তখন সিংহের সেই কথা বিশ্বাস করতে পারে!

সিংহ তখন সেই সিংহের বাচ্চাকে নিয়ে গেল একটা খালের ধারে।

তারপর সিংহ সেই বাচ্চাকে বলল, এখন তুমি ঐ জলের দিকে চাও। দেখ তো সেখানে কি দেখতে পাও।

বাচ্চা সিংহ তখন জলের দিকে চাইল। সে তখন জলের মধ্যে তার ছায়া দেখে বুঝল যে, সে ভেড়া নয়। সে সিংহ!

তখনই সে আনন্দের চোটে একটা গর্জন করে উঠল। আর ভেড়াদের দফা শেষ করতে ছুটল।

তাই দেখে, সিংহ জোর গলায় ব'লে উঠল,—তুই ছোট নও রে!

যে করে সর্বদা চেষ্টা, সেই বড় হয় রে!

পেতে হলে সুফল, চাই মনের বল !

বৃষ্টি হওয়ার যে কাল, সেই হল বর্ষাকাল।

কিন্তু একবার সেই বর্ষাকালে বৃষ্টি মোটেই হচ্ছে না। তাই মাঠে চাষ করার সুবিধে চাষীদের মোটেই হচ্ছে না। মাঠে চাষ না হলে, মাঠে ফসল হবে না। লোকে খেতে পাবে না।—তারা বাঁচবে না।

এক জায়গায় অনেক জন চাষীর ছোট ছোট জমি। সেই সব জমির কাছেই একটা পুকুর।

চাষীরা সেই পুকুরের পাড় থেকে নালা কেটে নিজেদের জমিতে জল নিচ্ছে। তাই দিয়ে তাদের চাষের কাজ বেশ হচ্ছে।

কিন্তু একটি চাষীর জমি রয়েছে সেই পুকুর থেকে অনেকটা দূরে। সেই চাষীও নিজের জমিতে জল নেওয়ার জন্য সেই পুকুরের পাড় থেকে নালা কাটছে। কিন্তু অনেকখানি জায়গা কাটতে হবে ব'লে, তার নালা কাটা আর শেষ হয় না। কাজ করতে আলস্য হয়। তাই পুকুরের জলও তার জমিতে যায় না।—এদিকে জমিতে চাষের মরশুমও চ'লে যায়।

অন্য চাষীদের জমিতে চাষের কাজ হয়। কিন্তু সেই চাষীর জমি না-চষা অবস্থায় প'ড়ে রয়। এইভাবে বেশ কিছু দিন চলছে।

ওর পরে একদিন সেই চাষী ভাবল,—আমার নালা কাটার কাজ কেন শেষ হয় না ?

আলস্য এসে আমার কাজ আটকাচ্ছে। আলস্যটা অতি

বদ। ওটাকে করতে হবে বধ। আমাকে হতে হবে পরিশ্রমী। তাহলে, পাব সুখ-মণি। হব আমি ধনী।

সেইদিন সে বদ আলস্যকে বধ করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেল। নালা কাটার কাজ চালাতে লাগল। বেলা প'ড়ে এল; তবু তার কাজে ঢিলেমি কি এল?—এল না।

তারপর সন্ধ্যাবেলা এসে গেল! তার নালা কাটাও হয়ে গেল।

পুকুর থেকে নালা দিয়ে জমিতে এল জল। শব্দ হতে লাগল—কল-কল-কল! তারপরে সেই চাষা পেল তার আলস্য ত্যাগ করার সুফল।—জমিতে হল চাষ। সেখানে ধানের গাছ গজিয়ে, করতে লাগল যেন নাচ!

রামকৃষ্ণের গল্প যেন মুক্তোকল্প—মুক্তোর মতো সুন্দর, মনোহর, হিতকর!

থাকলে বুদ্ধি, মিলবে ঋদ্ধি

ঋদ্ধি কাকে বলে?—সকল রকম উন্নতি, সম্পত্তি, সৌভাগ্য—এর প্রত্যেকটিকে বলে ঋদ্ধি।

মস্ত এক বড় লোকের মস্ত বড় এক আমবাগান। সেখানে গাছে গাছে আম ঝুলছে অফুরান।

সেই বড় লোক সোজা কথায় ব'লে দিয়েছেন: এই বাগান থেকে যার যত ইচ্ছে আম খাও। কিন্তু আম বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। আর সন্ধ্যের পরে এখানে কেউ থাকতেও পারবে না।

একদিন দুই বন্ধু গেল সেই আমবাগানে।

সেই দুই বন্ধুর মধ্যে, এক জনে ছিল খুবই হিসেবী। অন্য জন ছিল বেশ একটু সোজা ভাবের লোক।

সেই আমবাগানে তখন কত আমগাছ! গাছে গাছে কত আম! আমের যেন ধুমধাম!

সেই হিসেবী লোকটি তখন সেই বাগানের গাছগুলো গুণতে শুরু ক'রে দিল। কয়টা গাছ, গাছে গাছে কয়টা ক'রে ডাল। ডালে-ডালে কয়টা করে আম। কয়টা কাঁচা। কয়টা পাকা। কয়টা বাদুড়-চোষা—এইসব সে হিসাব করতে লাগল, আর তার খাতায় লিখতে লাগল।—সে তখন পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছে!—আর তার সোজা ভাবের সঙ্গীটি তখন আম খাচ্ছে, আর আনন্দে নাচ্ছে।

ঐভাবে সারাটা দিন চ'লে গেল।

সন্ধ্যাকাল এসে গেল। তখন সেই বাগানের পাহারাওয়ালা সেখানে এল। সেই দুই বন্ধুকে সে বলল, বাবু মশায়রা! সন্ধ্যের পরে কেউ থাকতে পারবে না এই বাগানের ভিতরে। আর আমও কেউ নিয়ে যেতে পারবে না সঙ্গে ক'রে।—এই হল এই বাগানের মালিক মহাশয়ের নিয়ম।—সুতরাং আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন এখন। এখনই এই বাগানের দরজা বন্ধ করে দেব।

সেই দুই বন্ধুর মধ্যে হিসেবী বন্ধু তখন হাঁ করে চেয়ে রইল সেই দারোয়ানের দিকে।—সে সারা দিন ধরে শুধু আম গুনেছে। আর তার সোজা ভাবের বন্ধুটি পেট ভরে আম খেয়েছে।

হিসেবী লোকটি তখন ফেলল একটা দীর্ঘশ্বাস। আর সেই সোজা ভাবের লোকটি যেন করতে লাগল একটু নাচ!

কেবল টাকাকড়ি, জমি-জায়গা নিয়ে মেতে থাকলে, জীবনটা যায় জলে! ভগবানের দিকে মন রাখলে, জীবনে সত্যিকারের সুখ মেলে।

মনোযোগী হতে হবে, কার্যসিদ্ধি হবে তবে

একদিন এক সাধু পথ দিয়ে চলেছেন। মনে মনে ভগবানের নাম বলছেন।

সাধু তখন দেখলেন,- বিয়ে করতে যাচ্ছে এক বর। তার সাথে রয়েছে অনেক বরযাত্রী, ছোট ও বড়।

বাজছে বাঁশি ঢোল-ঢাক। কত তার জাঁক।

শিকারী গুরু

এক শিকারী তখন একটা পাখীর ওপর বাণ মারবার জন্য লক্ষ্য করছে। সে ঐ বর ও বরযাত্রীদের দিকে মোটেই লক্ষ্য করছে না। ঢোল-ঢাকের শব্দ যেন তার কানেই যাচ্ছে না।— পাখি মারবার দিকে তার এতই মনোযোগ!

সেই সাধু সেই শিকারীকে নমস্কার করলেন। বললেন — তুমি আমার গুরু। ভগবানের দিকে কেমন মনোযোগ থাকা দরকার, তার শিক্ষা আজ থেকে আমার শুরু!

বকগুরু

সেই সাধু আর একদিন দেখলেন,—এক পুকুর পাড়ে রয়েছে এক বক। সে সেই পুকুর থেকে একটা মাছকে ধরবার জন্য লক্ষ্য করছে।

এদিকে, এক ব্যাধ সেই বককে বধ করবার জন্য তীর-ধনু ধরেছে। কিন্তু সেদিকে সেই বকের লক্ষ্য নেই।

সেই সাধু ঐ কাণ্ড দেখে, বককে করলেন নমস্কার। বললেন, হে বক, ভগবানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার তুমিই আমার গুরু হলে এইবার।

মৌমাছি গুরু

মৌমাছি অনেক দিন ধরে অনেক মধু যোগাড় করে মৌচাকে রাখছে। সে একা একা সেই মধু ভোগ করবে,—এই ইচ্ছা তার মনে জাগছে।

একদিন কোথা থেকে এল কে একজন। সে সেই মৌচাক দেখল। সে সেই মৌচাক ভাঙল: সব মৌ লুটে নিল।

সেই সাধু সেই মৌ লুটপাট কাণ্ডটা দেখলেন। তিনি মৌমাছিকে নমস্কার করলেন। বললেন,—হে মৌমাছি মশাই, তোমাকে নমস্কার! ধন-সম্পদ দেশের লোককে না দিয়ে, একা একা ভোগ করতে চাইলে, কি দশা হয় তার, তা আমি তোমার অবস্থা দেখে বুঝলাম। একটা সুশিক্ষা পেলাম।

ভালো হওয়ার ভান করাও ভাল

এক দেশের রাজা আর রানী। তাঁরা রাতের বেলায় বসে বসে নানা কথা বলছেন।

রাজার মুখ যেন মস্ত বড় এক পদ্ম ফুল, লাল টুকটুক! আর রানীর মুখখানি, যেন পূর্ণিমার চাঁদখানি!

কথা বলতে বলতে, রানী ব'লে উঠলেন,—ওগো রাজা মহাশয়! আমাদের মেয়েটি তো বড় হয়ে উঠেছে।—এবার তো তার বিয়ে দিতে হয়। তার জন্যে চেষ্টা করছ না কেন?

রাজা বললেন, রানী, তুমি বলেছ তো ঠিক কথাই। কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ঠিক মত একটি পাত্র জুটছে না। তাই তো মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

—পাত্র কেন জুটছে না ?—ব'লে উঠলেন রানী মহাশয়া।

—ঐ ওদিকে নদীর ধারে নাকি অনেক সাধু এসে জুটেছেন। তাঁরা তো সৎ লোক সবাই। তাঁদের এক জনের কাছেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও না, মহারাজ।

রাজা বললেন,—ঠিক কথা! ঠিক! কালই সেই সাধুদের এক জনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলব। আমাদের তো আর কোন ছেলে-মেয়ে নেই। ভবিষ্যতে আমাদের সেই জামাই হবে আমাদের এই রাজ্যের রাজা।

কালই সেই সাধুদের কাছে মন্ত্রীকে পাঠাব। আমাদের জামাই হওয়ার অনুরোধ জানাব।

তখন সেখানে রাজা ও রানীর কাছেই অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল একটা চোর। তার চেহারাটা বেশ সুন্দর। কিন্তু মনের ভাবটা যেন ছাই-গোবর—মোটেই ভালো নয়।

সেই চোর শুনল সেই রাজা ও রানীর সেই জামাই জোটানোর কথা

চোর ভাবল,—চুরি করতে এলাম। কিন্তু মস্ত বড় একটা ভালো খবর পেলাম।

আমি সাধু সাজব। নদীর ধারের সেই সাধুদের মধ্যে গিয়ে বসব। আমি কি জামাই হতে পারব না ? দেখা যাক কি হয়। এ সুযোগ ছাড়ব না।

চোর সেখান থেকে চ'লে গেল। তারপর সে সাধুর বেশ ধরল। নদীর ধারে গিয়ে সধুদের কাছে ব'সে পড়ল।

পরের দিন সকাল বেলায় রাজার মন্ত্রী মশাই সেই সাধুদের কাছে এলেন। তিনি হাতজোড় করে সাধুদের বললেন,—

রাজার মেয়ে সুন্দরী। দেখতে যেন অপ্সরী! আপনাদের মধ্যের একজনে তাকে বিয়ে করুন,—এই অনুরোধ করি।

মন্ত্রীর কথা শুনে, অনেক সাধু মারমুখো হয়ে বলে উঠলেন—বিয়ে!—পরিণয়!—নয়, নয়, নয়! উহা আমাদের জন্যে নয়! আমরা বিয়ে করব না! সাত পাঁক ঘুরব না। সংসারের পাঁকে পড়ব না!

মন্ত্রী তবু দমলেন না। বললেন,—রাজার জামাই যিনি হবেন, তিনি এই রাজ্য পাবেন। মহাসুখে খাবেন দাবেন, খেলবেন আর ঘুমাবেন!

সাধুরা তবু 'হাঁ' বললেন না, বললেন—'না'।

সেই সাধুবেশধারী চোরটা তখন মন্ত্রীর কাছেই বসেছিল।

মন্ত্রী হাতজোড় করে মিনতি করে সেইটাকে বললেন, হে প্রভুপাদ, আপনার কি নেই রাজার জামাই হওয়ার সাধ?

কিন্তু সেই চোর তখনও চুপ।

মন্ত্রী তখন 'হায়, হায়! বিয়ে করার জন্য একটি বাবু কোথায় পাওয়া যায়?'—এই কথা বলতে বলতে, আর ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন রাজার কাছে।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, কোন সাধুই জামাই সাজতে রাজী হলেন না। তাঁরা স্পষ্টই বললেন, বিয়ে বা পরিণয় আমাদের জন্যে নয়।—কিন্তু একটি সাধু 'হাঁ' বা 'না', কিছুই বললেন না।

আপনি সেই সাধুর কাছে যান। আপনার জামাই হওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। তা হলে হয় তো তিনি জামাই হতে চাইতে পারেন।

রাজা বললেন,—ঠিক কথা।

রাজা তখন তাঁর রাজসভার অনেককে নিয়ে, ভাঁড়কে নিয়ে চলে গেলেন সেই চোর-সাধুর কাছে।

তিনি সেই চোরের পায়ে পড়লেন। তাঁর জামাই হওয়ার জন্য চোরসাধুকে অনুরোধ করলেন। জামাই হলে, পরে রাজাও হবেন—তাও বললেন।

সাধুবেশী সেই চোর তখন ভাবল—আমি তো একটা চোর। আমি সাধুর বেশ ধরেছি। তাতেই, রাজা আমার পায়ে পড়ছেন, আমাকে তাঁর জামাই করতে চাইছেন, ভবিষ্যতে আমি রাজা হব, একথাও বলছেন।—তা হলে, আমি যদি সত্যিকারের সাধু হই, তা হলে, আমার ভাগ্যে আরও কত সুখ মিলতে পারে! —ভালো হওয়ার ভান করাও ভালো!

"জয়, জয়, জয়, হরি!

আমি এখন থেকে সত্যিকারের সাধু হওয়ার চেষ্টা করি।"
—এই ব'লে, সেই চোর বলে উঠল সেই রাজাকে—

বিয়ে করার নেইকো সময়।
সর্বদা ভগবানের নাম করতে হয়।
—ভগবানের দিকেই যেন আমার মন রয়।
জয়, হরি! জয়, জয়!

ডাকাতে কি করতে পারে!

একজন পথিক। তার অঙ্গে আছে জামা-কাপড়। সঙ্গে আছে কিছু টাকাকড়ি।

সে তখন একা। বনের ভিতরের পথ দিয়ে সে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হাঁচছে।

হঠাৎ তিনটা ডাকাত ছুটে এল। পথিককে ঘিরে ফেলল।

পথিক তখন ভয়েতে কাঁপতে লাগল। সে মনে মনে মা দুর্গার নাম জপ করতে লাগল।

দুর্গাদেবী মানুষের দুর্গতি দূর করেন। তাই মানুষ খুব বিপদে পড়লে দেবী দুর্গার নাম জপ করে।

সেই তিন ডাকাত তিন রঙের। একটা হচ্ছে কালো রঙের। একটা হচ্ছে লাল রঙের। একটা হচ্ছে সাদা রঙের।

তারা সেই পথিকের টাকাকড়ি সবই নিয়ে নিল। কালো ডাকাতটা তখন অন্য দুই ডাকাতের দিকে চেয়ে বলল, আয়, আমরা এই পথিকটাকে যমের বাড়ির পথে পাঠিয়ে দিই।

ঐ কথা শুনে, লাল রঙের ডাকাতটা ব'লে উঠল,—এই লোকটার টাকাকড়ি তো আমরা নিয়ে নিলাম। এখন একে মেরে ফেলার আর কি দরকার? একে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে আমরা চলে যেতে পারি।

তখন তাই করা হল। পথিককে একটা গাছের সাথে তারা বাঁধল। তারপর চলে গেল।

পথিক তখনও কাঁপছে, কাঁদছে আর মা দুর্গার নাম নিচ্ছে।

কিছু সময় চ'লে যায়।

বনের মধ্যে তখন কি একটা শব্দ শোনা যায়।

পথিক তখন আরও বেশী করে কাঁদতে থাকে। আর বেশী করে মা দুর্গার নাম জপ করতে থাকে।

হঠাৎ সেই সাদা ডাকাত এসে সেই পথিকের সামনে দাঁড়াল।

পথিক ভাবল, এবার বুঝি আমার জীবনটা গেল!—এই ডাকাত নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলতে এসেছে। হায়, হায়!

কিন্তু সাদা ডাকাত তার হাতের খাঁড়া তুলল না।

সে ব'লে উঠল, হে পথিক, তোমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তাই না? এখনই আমি তোমার বাঁধন খুলে দেব। তোমাকে এখান থেকে শহরে চলে যাবার পথ দেখিয়ে দেব।

ঐ কথা ব'লে, সেই সাদা ডাকাত সেই পথিকের বাঁধন খুলে দিল।

সে যেন পথিককে নূতন জীবন দিল।

ডাকাত বলল, হে পথিক, শহর এখান থেকে কাছেই রয়েছে। তুমি এখান থেকে সোজা চলে যাও। তুমি সুখী হও।

ঐ সব কথা বলে, সেই সাদা ডাকাত অন্য এক দিকে যেতে লাগল।

তাই দেখে, পথিক বলে উঠল—তুমি আমার কত উপকার করলে, ভাই। তুমি আমার বাড়িতে যাবে না? সেখানে কিছু খাবে না?—তা কি হয়! তুমি এখন চল আমার বাড়িতে।

ডাকাত ব'লে উঠল—না, না, না! আমি যেতে পারব না! যদি আমি তোমার বাড়িতে যাই, তা হলে রাজার কোটালের হাতে আমি যে ধরা পড়ব, ভাই! আমি একটা জংলী। জঙ্গলেই থাকব!

ঐ কথা বলে, ডাকাত চ'লে গেল।

পথিকের চোখে জল এল।

পথিক এখন ভাবল,—

মা দুর্গাকে ডাকার মত ডাকতে পারলে,
ডাকাতের হাত থেকেও রেহাই মেলে!

অদ্ভুত সেই ভূত

এক জায়গায় থাকত এক জগাই। সে বড়ই গরিব। কিন্তু সে ধনী হয়ে উঠতে চায়। অনেক টাকাকড়ি পেতে চায়। সে দিন-রাত খাটেও খুব ক'রে।

কিন্তু কপালে তার টাকা জোটে না। তার ধনী হয়ে উঠবার আশা মেটে না।

একদিন জগাই শুনল, তাদের গাঁয়ের কাছেই একজন সাধু এসেছেন কোথা থেকে। তিনি মস্ত বড় সাধু।

জগাই ছুটে গেল সেই সাধুর কাছে।

জগাই দিন-রাত সেই সাধুর সেবা করতে লাগল।

সাধু একদিন জগাইকে বললেন, তুমি কি চাও, বল তো।

জগাই হাতজোড় করে বলে উঠল,—আমি চাই টাকা!—অনেক টাকা!—আমি ধনী হয়ে উঠতে চাই।

সাধু হাসলেন।

বললেন সেই সাধু—ওরে জগাই, তুই ভূতের সাধনা কর। আমি একটা মন্ত্র বলে দিচ্ছি। তুই বনের ভিতরে গিয়ে এই মন্ত্র জপ কর। তা হলে, একটা ভূত তোর কাছে আসবে। কিন্তু তুই ভূতকে দেখে ভয় পাস না যেন। সেই ভূত তোর কোন ক্ষতি করবে না।—এই ব'লে, সাধু মশাই জগাইকে একটা মন্ত্র বলে দিলেন।

জগাই তখনই সেই মন্ত্র মুখস্থ করল। তার পরে সে চলে গেল ভীষণ একটা বনের ভিতরে।

সেখানে সে সেই মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

কিছু কাল পরেই, মস্ত বড়, ভীষণ এক ভূত জগাইয়ের সামনে হাজির।

ভূত ব'লে উঠল—আমাকে তুমি ডেকেছ কেন? কি করতে হবে, তা শীগ্‌গির বলো।

জগাই বলে উঠল—ওরে ভূত, তুই আমার চাকর হয়ে থাকবি। সব সময় আমার আদেশ পালন করবি। যদি না করিস, তবে আমি তোকে মেরে ফেলব।

ভূতটা গর্জন করে ব'লে উঠল,—বেশ কথা! বেশ!—আমি তোমার হুকুমমত সব কাজ করব। যদি তা না করতে পারি, তা হলে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমিও একটা কথা বলছি—

তুমি যদি সব সময়ে আমাকে কাজ দিতে না পার, আমাকে খাটাতে না পার, তা হলে, আমিও ভাঙব তোমার ঘাড়!—এই কথাটা জেনে রাখো সার!

জগাই ব'লে উঠল, আচ্ছা, আচ্ছা! তাই!

ভূত বলে উঠল, এখন আমি কি করব, শীগ্‌গির তাই বলো!

জগাই ব'লে উঠল,—আমার জন্য নিয়ে আয় ভাল ভাল খাবার।—অনেক খাবার চাই!

ভূত ব'লে উঠল—আচ্ছা, তাই! যাই আমি—যাই! খাবার আনতে যাই!

ভূত তখনই সেখান থেকে কোথায় চ'লে গেল!

একটুকাল পরেই, সেই ভূত বা সেই অদ্ভুত ভূত নানা রকম খাবার নিয়ে হাজির হল জগাইয়ের সামনে।

কাণ্ড দেখে, জগাই তো অবাক।

জগাই বেশ করে খেল। খুব করে খেল।

তখন সে কত খুশী!

ভূত ব'লে উঠল,—এখন কি করব, তাই বল, বাব মশাই।

জগাই বলে উঠল,—ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়। ঐখানে বানিয়ে ফেল একটা শহর অতি চমৎকার।

ভূত গর্জন করে বলে উঠল—ঐ যে ঐ পাহাড়, ওখানে এখনই আমি গড়ে ফেলব একটা নগর অতি সুন্দর, অতি চমৎকার। কোথাও তার তুলনা মিলবে না আর।

ভূতের যেমন কথা, তেমন কাজ।

ভূত ছুটল। এক লাফে আকাশে উঠল।

তার চার ধারে তখন বিজলী উঠল জ্বলি' জ্বলি!

বইল ঝড়ের বাতাস। জগৎ যেন করবে নাশ!

একটু পরেই, জগাই দেখল,—যেখানে ছিল মস্ত বড় পাহাড় সেখানে সেই পাহাড় নেই কো আর।

সেখানে তৈরী হয়ে গেছে মস্ত বড় এক শহর—সুন্দর, মনোহর।

জগাই তাই দেখে, বলল, ওরে ভূত, ঐ শহরে একটা রাজবাড়ি তৈরী কর। তারপর আমাকে রাজার পোশাক পরিয়ে সেখানে সিংহাসনে বসা।

ভূত তখনই সেই সব করে ফেলল।

জগাই তখন হল যেন এক জাঁদরেল রাজা! কত তার সৈন্য-সামন্ত! কত লোক-লস্কর! কত ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি!

কিন্তু ভূত তার চুক্তির কথা ভোলে না।

সে বলে উঠল, হে জগাই রাজা! এখন কি করব, তাই বল। আমাকে সব সময় কাজ দেওয়া চাই! না হলে, তোমার নিস্তার নাই!

চট্ করে জগাইয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

সে একটা কুকুরের লেজ কেটে ফেলল। তারপর সেই

বাঁকা লেজটা ভূতের হাতে দিয়ে, ব'লে উঠল—এই বাঁকা লেজটি সোজা করে ফেল। যদি তা না পার, তাহলে মনে কর, আমার খড়্গের এক ঘায়ে তোর জীবন গেল!

ভূত এইবার কেঁপে উঠল। সে কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করতে লেগে গেল। সময়ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যেতে লাগল।

কিন্তু সেই ভূত কি কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করতে পারল?—পারল না! পারল না!

তখন ভূত, তার মাথা কাটা যাওয়ার ভয় করে, তখনই সেখান থেকে দিল দৌড়!

জগাই হইচই করে বলে উঠল,—পালা! পালা!

দেখা গেল যে বিশ্বাসের জোরে অনেক সময়ে, অসম্ভবও সম্ভব হয়ে পড়ে।

এই রকম আরও কত চমৎকার চমৎকার গল্প শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। লোককে তিনি কত উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন,—ওরে মানুষ! তোমার মধ্যে অনেব আছে। প্রতিদিন চেষ্টা করে সেই শক্তিকে জাগাও, নিজের উন্নতির কাজে তা লাগাও! সকলের উন্নতির কাজে তা লাগাও।—নিজে ধন্য হও। অন্যকেও ধন্য করে দাও।

ফোঁস-ফোঁসের ফল

এক মাঠের ভিতরে থাকত একটা সাপ। সে ছিল যেমন লম্বা, তেমন মোটা। তার রং ঘোর কালো।

তার বিষ ছিল ভীষণ। সেই সাপ যাকে কামড় মারত, তাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে তবে ছাড়ত।

সে অনেককে কামড়েছে—অনেককে তার বিষের জোরে মেরে ফেলেছে।

এক দিন সেই মাঠের ভিতর দিয়ে চলেছেন এক সাধু।

সাধুর মাথায় জটা। মুখে ঝুলছে দাড়ি। গলায় মালা। তাঁর গায়ের রংয়ে সে জায়গা তখন আলোকিত।

সাধু তখন গাইছেন হরি-নাম। তাঁর গলার সুর কত মধুর!

সাধুকে মাঠের সেই জায়গা দিয়ে যেতে দেখে, রাখাল ছেলেরা জোর গলায় ব'লে উঠল,—সাধু বাবা, ওখান দিয়ে যাবেন না, যাবেন না!

সাধু বললেন, কেন যাব না? ওখানে কি আছে?

রাখাল ছেলেরা ব'লে উঠল,—ওখানে আছে একটা সাপ। সেটা খুব বড় আর খুব লম্বা।

মানুষ দেখলেই, সেই সাপটা তেড়ে আসে। কামড়ে দেয়। বিষ ঢুকিয়ে দেয় মানুষের শরীরে। মানুষ মরে যায়। ওদিকে যাবেন না, সাধু বাবা।

সাধু হাসলেন। বলে উঠলেন—ওখানে আছে সাপ? তার আছে বিষ? আমারও জানা আছে সাপকে শায়েস্তা করার মন্তর। আমার মনে নেই কো ভয়-ডর।—আমার সহায় আছেন ঈশ্বর।

সাধু ভয়কে জয় করে চলতে লাগলেন। তখনই সেই ভীষণ সাপ সেই সাধুকে দেখল।

সে সাধুর দিকে তেড়ে এল। ফোঁস-ফোঁস করে ফণা তুলল।

সাপ করল ফোঁস-ফোঁস।

সাধু বলে উঠলেন,—রোস! রোস!

সাধু তখনই কি একটা মন্ত্র জোরে জোরে বলতে লাগলেন।

সেই মন্ত্রের কত গুণ, কত তেজ!

সেই ভীষণ সাপের তখন কোথায় গেল ফোঁস-ফোঁস! আর কোথায় গেল ফণা!

সে যেন হয়ে গেল একটা কেঁচোর মতো। পড়ে রইল সাধুর পায়ের কাছে।

সেই সাধু সেই সাপের মাথাটা ধরে তাকে তুললেন। বললেন, ওরে বাছা সাপ! তুই কত পাপ পূর্ব জন্মে করেছিস। তাই এ জন্মে সাপ হয়ে জন্মেছিস। কিন্তু এখনও তুই পাপ করছিস—কত লোককে তুই কামড়ে দিয়েছিস—মেরে ফেলেছিস। এখনও তোর ভালো হওয়ার সময় আছে। তুই হিংসা করা ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আমার কাছ থেকে এখন একটা মন্ত্র জেনে নে। সেই মন্ত্র তুই সব সময়ে জপ কর। সৎ পথ ধর।

সাপ সাধুর পা চাটতে লাগল। সে বলল,—আমাকে মন্ত্র বলে দাও, প্রভু। মন্ত্র ব'লে দাও

সাধু তখন সেই সাপকে একটা মন্ত্র বলে দিলেন।

সাপ সেই মন্ত্র মুখস্থ করে নিল।

সাধু সাপকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

সেই সাপ সেই মাঠেই থাকে। কিন্তু সে লোক দেখলে এখন আর তেড়ে আসে না, কামড়ায় না। হিংসা করে না।

সে সব সময়ে সেই সাধুর দেওয়া সেই মন্ত্র জপ করে।

সেও যেন হয়ে গেল এক সাধু।

কয়েক দিন ধরে রাখাল ছেলেরা দেখল, সাপ আর তাদের দিকে তেড়ে আসে না। নড়াচড়াও করে না। ফোঁস-ফোঁস করে না।

সাপের সেই অবস্থা দেখে, রাখাল ছেলেরা ভাবল, সেই

সাধু মশাই এই ভীষণ সাপকে একেবারে জব্দ করে দিয়ে গেছেন।

এই শয়তান সাপ অনেক দিনই আমাদের কামড়াবার চেষ্টা করেছে। আমাদের হিংসা করেছে। এইবার আমরা ওর সেই শয়তানির শোধ তুলব।

ঐ সব কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছেলেরা লাঠি দিয়ে সাপের উপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। কেউ কেউ বা সাপের মাথায় লাথি মারতে লাগল।

একজনে সেই সাপের লেজ ধরে তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগল।

কিন্তু সেই সাপ, ঐ রকম মারধর খেয়েও, অত্যাচার পেয়েও, কাউকে কিছুই বলল না। কামড়াল তো না-ই। এমন কি ফোঁস ফোঁসও করল না।

সে যেন হয়ে রইল সাপ-সাধু। কিন্তু সেই অত্যাচারের ফলে, সাপ বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ল। সে কোন রকমে গিয়ে তার গর্তের ভিতরে ঢুকলো। আর আর্তনাদও করতে লাগল।

ওর পরে কিছু দিন চ'লে গেল।

এক দিন সেই সাধু আবার এলেন সেই পথে।

তিনি সাপকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি 'ওরে সাপ!' বলে সেই সাপকে ডাকতে লাগলেন।

সাপ তখন অতি কষ্টে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। সাধুকে প্রণাম করল।

সাধু বললেন—তোর চেহারা খুব খারাপ দেখছি কেন? কি হয়েছে তোর?

সাপ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল—প্রভু, আপনি আমাকে

বলেছেন—কাউকে হিংসা কোরো না।

তাই আমি কাউকে হিংসা করি না। কামড়াই না। একদম নিরীহ হয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছি।

সেই সব রাখাল ছেলেরা আমার এই ভাব দেখে—আমি আর হিংসা করি না দেখে—আমাকে খুব করে মেরেছে। তাই আমার এই দশা হয়েছে। তারা এখন আমাকে মোটেই ভয় করে না। তারা মনে করে, তাদের ক্ষতি করবার শক্তি আমার আর নেই। তাই তারা এখন আমার সামনে নাচে ধেইধেই!

সাধু বলে উঠলেন, ওরে সাপ! ওরে বিষধর! তুই আজ থেকে মানুষ দেখলেই ফোঁস-ফোঁস করা শুরু কর। কিন্তু কাউকে কামড়াবি না। শুধু ফোঁস-ফোঁস করবি। আমি তোকে হিংসা করতে নিষেধ করেছি। কিন্তু ফোঁস-ফোঁস করতে কি নিষেধ করেছি? তা তো করি নি।

তুই দেখাবি রোষ।
করবি ফোঁস-ফোঁস।

তা হলে, কেউ আর তোর উপর অত্যাচার করতে সাহস করবে না।

ঐ কথা বলে সাধু চলে গেলেন।

সাপ সেই দিন থেকে সাধুর সেই ফোঁস-ফোঁস করার উপদেশ পালন করতে লাগল।

সেই ফোঁস-ফোঁসের ফলও ফলল।—

কেউ আর তার উপর অত্যাচার করতে সাহস পেল না। সাপ সুখে দিন কাটাতে লাগল।

কার কাছে চাইব ?—কার কাছে পাইব ?

এক জায়গায় থাকতেন এক ফকির। তিনি লোককে কত ভালো ভালো উপদেশ দিতেন। ভালো কাজ করতে বলতেন। অনেক লোক নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে আসত।

সেই সকল লোককে খাওয়াবার জন্য ফকির সাহেবের ইচ্ছা হত!

কিন্তু নানা লোককে খাওয়াতে হলে, খাদ্য জিনিস কিনবার জন্য টাকা তো থাকা দরকার। ফকির সাহেবের সেই টাকা ছিল না। তাই তিনি লোককে খাওয়াতে পারতেন না। তাই তাঁর মনে খুব দুঃখ হত।

এক দিন সেই ফকির সাহেব ভাবলেন,—এই রাজ্যের বাদশার তো অনেক টাকাকড়ি আছে। আমি তাঁর কাছে যাই। কিছু টাকা তাঁর কাছে চাই। যদি তাই পাই, তা হলে তাই দিয়ে নানারকম খাদ্য জিনিস কিনব। লোককে খাওয়াব।

ফকির সাহেব তখনই চলে গেলেন সেই বাদশার বাড়িতে।

বাদশা তখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন—ভগবানকে বা আল্লাকে ডাকছিলেন—প্রার্থনা করছিলেন।

বাদশাহ আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে করতে তখন বলছিলেন,—হে খোদা, হে আল্লাহ! আমাকে আরো বেশি করে টাকাকড়ি দাও। ধন-দৌলত দাও!

ফকির সাহেব, আল্লার কাছে বাদশার ঐ প্রার্থনা শুনেই, ভাবলেন—আমি গরিব। তাই বাদশার কাছে টাকাকড়ি ভিক্ষা করতে এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি, এই বাদশাও গরিব। তিনি যদি গরিব না হতেন, তা হলে তিনি কি খোদার কাছে টাকা-কড়ি চাইতেন ? সুতরাং বাদশা তো এক গরিব ভিক্ষুক। এর

কাছে আমি আর কি ভিক্ষা চাইব! আমি এখন এখান থেকে চ'লে যাই।

ঐ কথা ভেবে, ফকির সাহেব তখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

বাদশার নামাজ পড়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

তিনি ফকিরকে চলে যেতে দেখে ইসারা করে কাছে ডাকলেন।

বাদশা ফকিরকে বললেন—আপনি কি জন্য আমার কাছে এসেছেন? এখন আমাকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন কেন?

ফকির বলে উঠলেন—হে বাদশাহ, আমি আপনার কাছে কিছু টাকা-কড়ি ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখলাম, আপনি নামাজ পড়বার সময়ে খোদার কাছে ধন-দৌলত, টাকাকড়ি পেতে চাইছেন।

সুতরাং বুঝতে পারছি, আপনিও একজন ভিক্ষুক। আপনি যখন ভিক্ষুক, তখন আমি আর আপনার কাছে কি ভিক্ষা চাইব! —এই ভেবে আমি আপনাকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমি খোদার কাছেই ভিক্ষা চাইব। মানুষের কাছে আর ভিক্ষা চাইব না।

বিশ্ব আছে মায়ের মাঝে

কৈলাসে রয়েছেন দেবী দুর্গা। তাঁর আর একটি নাম ভগবতী। তিনি আলোকবতী—জ্যোতির্ময়ী।

একদিন তিনি গলায় একটা হার পরেছেন। সেই হার অতি চমৎকার।

র্গা দেবীর দুই ছেলে—গণেশ আর কার্তিক।

গণেশ আর কার্তিক সেই হার দেখল। সেই হার পেতে তাদের ইচ্ছা হল

তারা দু'জনেই মা ভগবতীকে বলল,—মা, মা ! আমাকে ঐ হারটা দাও না !

ভগবতী তখন কাকে সেই হার দেবেন ?—যাকে দেবেন না, সে-ই তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।

ভগবতী তখন একটা বুদ্ধি করলেন।

তিনি দুই ছেলেকে বললেন,—তোমরা দুই জনে এখনই সমস্ত জগৎটা প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে পড়। প্রদক্ষিণ করে, যে আগে আসতে পারবে আমার কাছে, এই হার তার ভাগ্যেই আছে। তাকেই আমি দেব এই হার।

ঐ কথা শুনে, কার্তিক তখনই তার বাহন ময়ূরের পিঠে চড়ল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে পড়ল।

সে ভাবল—আমার দাদার বাহন তো ইঁদুর। দাদা তো তার সেই বাহনে চড়ে জগৎটা প্রদক্ষিণ করবে। তাতে তার অনেক সময় লাগবে।

আমার বাহন হচ্ছে ময়ূর। আমি ময়ূরে চড়ে জগৎ প্রদক্ষিণ করে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে আসব। দাদার চেয়ে অনেক আগেই আমি মায়ের কাছে এসে পড়ব। তখন ঐ হার আমিই পাব। দাদা পাবে না—দাদা পাবে না।

কার্তিক ময়ূয়ের চড়ে জোর বেগে চলতে লাগল।

কিন্তু গণেশ কি করল ?

সে ভাবল এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা তো আমার এই মা ভগবতীর মধ্যেই রয়েছে।—আমি আমার এই মাকেই প্রদক্ষিণ করব।—

তাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হবে।

ঐ রকম ভেবে, গণেশ তার মা ভগবতীকে একবার প্রদক্ষিণ করল তারপর চুপ করে ভগবতীর কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে কার্তিক তার ময়ূরে চড়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে অনেক সময় পরে মা দুর্গার কাছে ফিরে এল।

তখন সে দেখল তার ভাই গণেশ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কার্তিক গণেশকে বলে উঠল,—দাদা, তুমি কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে এসেছ? বোধ হয় করনি।—অত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা প্রদক্ষিণ করা যায়?

গণেশ ব'লে উঠল,—যায়।—অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা যায়। আমাদের এই যে মা—এই ভগবতী—এই দুর্গা—ইনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই রয়েছেন! ইনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড!—তাই আমি আমাদের এই মাকেই প্রদক্ষিণ করেছি!—অন্য কোথাও মিছামিছি ঘুরতে যাইনি!

কার্তিক দেখল,—সে হেরে গেল!

মা ভগবতীর গলার হার,
তখন গণেশ পেল উপহার।

এক রাজার সভায় এক বাজিকর বাজি দেখায়। রোজই দেখায়।

লোকে কত আনন্দ পায়। আনন্দে ডিগবাজি খায়।

একদিন সেই বাজিকর বাজি দেখাচ্ছে।

হঠাৎ কি হল—বাজিকরের জিহ্বাটা উলটে গেল। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

ঐ অবস্থাটার নাম হল কুম্ভক।

সেই বাজিকরের শরীর তখন একেবারে হয়ে গেল যেন একটা মড়া।

সবাই মনে করল, বাজিকর মরে গেছে।

তখন তাকে একটা মাঠের মাঝে কবর দেওয়া হল।

কিন্তু, আসলে সেই বাজিকর কি তখন মরেছে?

—মরেনি। তার কুম্ভক হয়েছে।

ওর পরে, বছরের পর বছর এল আর চলে গেল।

সেই রাজা মরে গেলেন। তাঁর রাজ্যও চলে গেল।

কয়েকশ বছর চলে গেল।

তখন এল নতুন লোক, নতুন কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহার।

যেখানে সেই বাজিকরের কবর ছিল, সেখানে তখন খুব বড় একটা জমি হয়ে গেছে।

একদিন কয়েকজন চাষী বাজাতে লাগল বাঁশি। করতে লাগল হাসাহাসি।

তারা সেই জমিতে চাষ দিতে লাগল।

হঠাৎ বাজিকরের সেই কবর তাদের লাঙলের ফলায় ঠেকল।

চাষীরা তখন সেই কবরটা খুঁড়ল। তখন সেই বাজিকরের দেহটা বেরিয়ে পড়ল?

তার মুখে ও জিহ্বায় একটু নাড়া লাগল।

অমনি তার কুম্ভক হয়ে গেল শেষ।

তখনই সে ব'লে উঠল; লাগ ভেল্‌কি লাগ! টাকা দাও! কাপড় দাও! রসগোল্লা দাও! সন্দেশ দাও!

ঐ কথা শুনে, চাষীরা মনে করল—এতো ভূত ছাড়া আর কিছু নয়!

—আমাদের মেরে ফেলবে।

তারা দিল দৌড়।

বাজিকর তখনও বলছে ঃ টঙ্কা দে! টঙ্কা দে! কলা দে। মূলো দে!

সেই বাজিকর কুম্ভকের অবস্থাটা পেয়েছিল।—সে অবস্থা সাধুভাবের একটা খুব বড় অবস্থা।

কিন্তু তার মন সেইভাবে বিভোর ছিল না।

তার মনে তখনও ছিল তুচ্ছ ধনদৌলত, টাকাকড়ির চিন্তা।

তাই সে, উঁচু অবস্থায় উঠেও, আসলে নীচু হয়েই রইল মানুষের মতো।

মনের ভাব করলে মহান,
দেন দেখা সে শ্রীভগবান।

অমৃতলোকে যাত্রা

সুখের স্বর্গকে বলা হয় অমৃতলোক—অমৃতধাম। পুণ্যের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা সেখানে গমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকলের উপকারী। কিন্তু অপকারী রোগ তাঁকে আক্রমণ করল। তাঁর গলায় একটা ঘা হল।—কঠিন সেই রোগ।

বড় বড় চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতায় নিয়ে এলেন তাঁর ভক্তরা।

শ্যামপুকুরে এক বাড়িতে তাঁকে রাখলেন তাঁরা। চিকিৎসকও নানারকম ওষুধ দিয়ে রোগকে দিতে লাগলেন তাড়া। কিন্তু রোগ যেন পণ করল, রোগীকে সে শেষ না করে ছাড়বে না।

কলকতার নিকটে কাশীপুর অঞ্চল। সেখানে একটি বাগান-

বাড়িতে এনে শ্রীরামকৃষ্ণকে রাখা হল। কিন্তু রোগ তাঁর বাড়তেই লাগল। সকলের মনে শঙ্কা জাগল।

কয়েকটা মাস চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতধামে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল।

ডাক্তরা কাঁদেন। কাঁদেন আরও কত লোক।

১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বারটি ছিল রবিবার। সময়—সন্ধ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সন্ধ্যা এসে গেল।

তিনি সমাধিস্থ হলেন।

সেই সমাধি আর ভাঙল না।

তাঁর প্রাণ স্বর্গের দিকে হল ধাবমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেন এক অতি উত্তম বন! সেখানে কত রকম উত্তম আদর্শের ফুল ও ফল।

তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখেছি :

"কর যত্ন, হবে জয়। জীবাত্মা অনিত্য নয়।"

* * * *

সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না, মানব
কর যুদ্ধ বীর্যবান। যায় যাবে যাক প্রাণ!
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

* * * *

সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্যে হও রত;
একমনে ডাক ভগবান।
সংকল্প সাধন হবে; ধরাতলে কীর্তি র'বে,
সময়ের সার বর্তমান।

অমৃতভৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ

হুগলী জেলার কামারপুকুর নামক গ্রামে জন্ম।

পিতার নাম ঃ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

মাতার নাম ঃ চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর পিতার তৃতীয় সন্তান।

রামকুমার ও রামেশ্বর নামে তাঁর আরও দুই ভাই ছিলেন।

ছেলেবেলার নাম ঃ গদাধর।

তাঁর পত্নীর নাম ঃ সারদামণি।

কণ্ঠে ক্ষতরোগের আক্রমণ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ।

সমাপ্ত